

আমানত

- লক্ষ্মী

১৯৭৮ সাল। নতুন চাকরি করছি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বড় ভাই আর সব নাম ধরে ভাই। এখানে স্যার বলে কেউ নেই। প্রতিষ্ঠানটি একটি বহুমুখী সেবামূলক প্রকল্প।

চাকরি নতুন। তাই সব ডিপার্টমেন্টের ভাইবোনদের সঙ্গে তখনো ভালো করে পরিচয় হয়নি বা সবার নামও ভালো করে জানি না। প্রকল্পটি শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের সময়। যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা ও সেবা দেয়ার জন্য ইনডিয়ার আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জ নামক স্থানে।

স্বাধীনতার পর কিছু রোগীসহ এই টিমটা চলে আসে প্রথমে ঢাকায় ও পরে ঢাকার অদূরে সাভারে। সেখানে স্থায়ীভাবে গড়ে উঠে প্রথমে হাসপাতাল, পরে স্কুল, কাঠ কারখানা, সেলাই সেন্টার, বুটিক ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

আমি ছিলাম স্কুলের চিটার। এখানে সব ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের নিয়ে একটি পরিবারের মতো। সবাইকে চিনতে হয়, জানতে হয়। সবার জন্য এক ডাইনিং রুম, এক খাবার। সবারই সকালে এক ঘণ্টা কৃষি কাজ বাধ্যতামূলক। মাসিক মিটিংও এক সঙ্গে এক হলে হয়। সুতরাং সবাইকেই ধীরে ধীরে জানতে হবে, চিনতে হবে। একই পরিবারের মতো।

একদিন ছুটির দিনে নাশতা খাওয়ার পর মানিকভাই তার ক্লোজ যারা তাদের গিফট দিচ্ছেন। কারণ তিনি সম্প্রতি ইনডিয়া থেকে অফিশিয়াল টুর শেষ করে দেশে এসেছেন। শিরিনআপা (সদ্য বিবাহিতা)-কে একটি লক্ষ্মীবিলাস তেল, রহমানভাইকে একটি টাই, কাউকে কলম, কাউকে চাবির রিং, ব্যাগ, সাবান ইত্যাদি গিফট হাতে নিয়ে প্যাকেট খুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন আর সবাই মিলে খুব হই চই করছে।

আমি নতুন এবং লাজুক প্রকৃতির। বিরাট ডাইনিং রুমের এক পাশে বসে নাশতা খাচ্ছি আর এ দৃশ্য উপভোগ করছি।

সবার শেষে আমার পাশে এসে আমাকে একটি প্যাকেট দিয়ে বললেন, এটা আপনার জন্য।

অল্প পরিচিত একজনের কাছ থেকে গিফট নেবো কিভাবে? আবার সবাই খুশি মনে নিচ্ছে, সেখানে না বলবো কেমন করে? একটু ইতস্তত করে বললাম, প্যাকেটটা আপনার কাছে আমানত রইলো। এই বলে রুমে চলে এলাম।

এরপর ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আমার ভালো মতো পরিচয় হলো, জানা-শোনা হলো। কিন্তু কখনো তাকে ওই প্যাকেট সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। তিনিও আর কিছুই বলেননি।

ধরে নিয়েছি, ফ্যামিলির কাউকে দিয়ে দিয়েছেন প্যাকেটটা।

দীর্ঘ সময় চাকরি করলাম। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আমাকে কাজও করতে হয়। তখন তার সঙ্গে ভালো পরিচয়, জানা-শোনা হলো।

পরে আমাদের বিয়ে হলো। বিয়ের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলাম। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি।

বিয়ের পর ছুটি শেষে অফিসে যোগ দিই। বিয়ের পর প্রতিষ্ঠানে প্রথম রাত।

মানিকভাই একটি বড় সুটকেস আমার সামনে রেখে একটি চাবি দিয়ে বললেন, সুটকেসটা খোলেন।

সুটকেসটা খুললাম। দেখলাম বিরাট বড় সুটকেসের কোণায় শুধু ছোট্ট একটি পলিথিনের পোটলা।

আমাকে বললেন, প্যাকেটটা নিয়ে এসো এবং খুলে দেখো এটার মধ্যে কি আছে?

প্যাকেট এর ভেতর ছিল একটি ইনডিয়ান সিল্ক শাড়ি আর হাতের কাজ করা একটি পেটিকোট। শাড়ি এবং পেটিকোট দুটোই খুব সুন্দর।

মানিকভাই আমাকে বললেন, এটা তোমার আমানতের প্যাকেট এবং এই সুটকেসটা আর একদিনও খুলিনি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কারণ আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না এতোদিন এভাবে একটা প্যাকেট থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে শাড়িটা পরে তাকে সালাম করি। এবং আমার চোখ দিয়ে দুই ফোটা সুখের অশ্রু ঝরে পরে।

আমাদের বিবাহিতা জীবনের চব্বিশ বছর চলছে। আমার কাছে মনে হয় এখনো এ সামান্য গিফটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার গিফট।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

বিরল সম্পর্ক

আমার বিয়ে হয়েছে তেরো বছর হলো। একটি ছেলে আছে।

বাবা-মায়ের পছন্দ করা ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়। উচ্চ শিক্ষিত, বাড়ি, টাকা-পয়সা কোনো কিছুই অভাব নেই। স্বামী যে পরিমাণ ধনী ঠিক সেই পরিমাণই কৃপণ। পঞ্চাশ টাকা যে চাইবো, সাহসে কুলায় না। বুকের ভেতর খুব কষ্ট হয় যখন দেখি ছোট বোনেরা স্বামী, বাচ্চাসহ বেড়াতে আসে। কোনো কিছু দেয়া তো দূরে থাক, ঠিক মতো আপ্যায়ন করতে পারি না। সারাক্ষণ ক্যালকুলেটরে হিসাব রাখে। সব কিছুর চাবি ওর কাছেই থাকে।

ঈদে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের কাপড়-চোপড় দেয় এবং প্রায়ই ওদের খোজখবর রাখে। প্রয়োজনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। কিন্তু ঘরে বউ-বাচ্চার খবর নেই।

বিয়ের দুই বছর পরে ছেলে হয়। এরপর প্রায় এগারো বছর হতে চললো। কোনো শারীরিক সম্পর্ক নেই। কখনো অনুভব করেনি। হয়তো শারীরিক চাহিদাই নেই। এমনিতে তেইশ বছরের বড় সে। তারপরেও বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সামনে ও আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এটাই তুলে ধরেছি।

ওর আসল চেহারা দেখালে প্রত্যেকের কাছে খুব ছোট হয়ে যাবো। তাই কাউকে কিছুই বলি না। সংসারে শান্তির জন্য স্বামীকেও কিছুই বলি না।

চাকরি করতে দেবে না, হাত খরচের পয়সাও দেবে না। বাসায় হাতের কাজ করবো তাও তার সহ্য নয়। আমি থ্যাঙ্কুয়েট।

আমার যন্ত্রণার কথা কাকে বলবো? মাকে বললে শুধু কাদবেন, বোনদের বললে কষ্ট পাবে। স্বামীকে বললে সংসারে অশান্তি বাড়বে। কি দরকার? যাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি সেই আমাকে লুকিয়ে একে জমি দিয়ে দিল, ওকে হাঙা কিনে দিল, তাকে মোবাইল ফোন দিল।

জিজ্ঞাসা করলে, পুরোপুরি অস্বীকার।

নিজে বেশ আকর্ষণীয়, ইচ্ছে করলে অন্যের হাত ধরে চলে যেতে পারি। কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যৎ, সমাজ, সংসারের চাপে এবং স্বামীর সম্মানের দিকে তাকিয়ে, সর্বোপরি পরকালের ভয়ে পারিনি।

আমাদের সম্পর্ক না স্বামী-স্ত্রীর, না বন্ধুত্বের, না শত্রুতার, না বিশ্বস্ততার।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ক্ষত চিহ্ন

– ইমরান হাসান

ইলশেগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, কলেজ ফাইলটা মাথার ওপর ছাতার মতো করে ধরে সে দাড়িয়েছিল একটি দেবদারু গাছের নিচে। গাছটি অনেক পুরনো হওয়ায় গাছের ডালপালা কিছুটা শুকিয়ে গেছে। যার ফলে দেবদারু গাছের নিচে দাড়ানো আর খোলা আকাশের নিচে দাড়ানোর ব্যবধান উনিশ-বিশ মাত্র। গত দুই দিন ধরেই এ রকম গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের দরুণই এ অকাল বৃষ্টি। সম্ভবত সে কোনো রিকশা অথবা বেবিট্যাকসির আশায় এভাবে রাস্তার পাশে দাড়িয়েছিল।

এই রাস্তাটায় সব সময় রিকশা পাওয়া গেলেও আজ এর ব্যতিক্রম। সম্ভবত অকাল বৃষ্টিই এর কারণ। মৌসুমহীন এই হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাত জ্বর অথবা ঠাণ্ডায় পড়তে হতে পারে এই ভয়ে অনেক রিকশাচালক ঘর থেকে বের হয়নি। তবে কিছু কিছু রিকশাচালক মাথায় পলিব্যাগ বেধে রাস্তায় বের হয়েছে অতি মুনাফার জন্য। পলিব্যাগে মাথা বাধা এমন এক রিকশাচালকের রিকশা চেপে আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। রিকশার হুড তুলে পা থেকে কোমর পর্যন্ত পলিব্যাগ দিয়ে ঢেকে অপরূপ বাংলার বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরছিলাম।

তিন বছর লিবিয়া প্রবাসী থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে এক সপ্তাহ পার না হতেই প্রকৃতির রোষানলে পড়তে হলো আমাকে।

যাই হোক। মরুভূমির দেশ থেকে এসে মৌসুমহীন বৃষ্টি পেয়ে খুব একটা খারাপও লাগছিল না। তবে সারা দিন গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে কিছুটা বিরক্তও হচ্ছিলাম। রিকশায় বসে বসে রবিঠাকুরের সেই বিখ্যাত *আষাঢ়* কবিতাটা মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম। হঠাৎ করেই ঘট করে একটা শব্দ হলো এবং একটু পরেই রিকশা থেমে গেল।

প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে, হঠাৎ থামলে কেন?

ভাইজান, রিকশার চেইন পড়ে গেছে। চেইনে পানি পাইছে তো, তাই ...।

ঠিক আছে, রিকশা রাস্তার এক পাশে সাইড করে চেইন তুলে নাও।

রিকশাচালক আমার কথা মতোই রিকশা রাস্তার বামপাশে সাইড করে রিকশার চেইন লাগাচ্ছিল। আর তখনই সেই দেবদারু গাছের নিচে দাড়ানো মেয়েটি আমার চোখে পড়লো। মেয়েটি মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাড়িয়ে আছে।

রিকশা থেকে নেমে হাতের ছাতাটি মাথার ওপর মেলে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাড়িলাম।

আমাকে দেখেই মেয়েটি মাথার ওপর ধরে রাখা ফাইলটি বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দাড়িয়ে আমাকে এক পলক দেখে মাটির দিকে দৃষ্টি দিল।

অনেক দিন আরব দেশে থাকার ফলে অভ্যাসবশত মেয়েটিকে সালাম দিলাম।

মেয়েটি আমার সালামের উত্তর না দিয়ে মাথা অবনত করে মাটির দিকেই চেয়ে রইলো।

আমার পরিচয় দিলাম এবং সঙ্গে এও বললাম যে, আমি লিবিয়া প্রবাসী ছিলাম। গত এক সপ্তাহ আগে দেশে এসেছি, গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি।

আমার এই উপযাচক ধরনটা হয়তো মেয়েটির মনে ধরেনি। কারণ মেয়েটি যেভাবে ছিল সেভাবেই ঠায় দাড়িয়ে রইলো।

এশিয়া, ইউরোপের ছেলে-মেয়েদেরকে হাই বললে সঙ্গে সঙ্গে তারা *হ্যালো*, *হাউ আর ইউ?* ইত্যাদি নানান ধরনের উত্তর দিয়ে থাকে। বুঝলাম আমাদের দেশের মেয়েরা এখনো তাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।

উত্তর পাবার আশা যখন জিরোর কোঠায় তখন আবার নিজ থেকেই বললাম, আপনি এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এখানে দাড়িয়ে আছেন রিকশার জন্য বুঝি?

মেয়েটি মাথা নেড়ে আমার কথায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল।

ইতিমধ্যে আমার রিকশাচালক রিকশার চেইন লাগিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে।

ভাইজান, রিকশায় ওঠেন।

আমি রিকশাচালককে একটু দাড়াতে বলে মেয়েটিকে বললাম, দেখুন, এই রাস্তায় এখন খালি রিকশা পাওয়া যাবে না। আপনি ইচ্ছা করলে আমার রিকশাটা নিয়ে যেতে পারেন।

আমার কথা শুনে মেয়েটি না সূচক মাথা নাড়া দিল।

আবারও বললাম, দেখুন, আমার কাছে ছাতা আছে। তাছাড়া আমার বাসা এই সামনে। আপনি ইচ্ছা করলে এই রিকশাটা নিতে পারেন।

আমার এই কথা শুনে কি বুঝলো কে জানে, মেয়েটি কতোক্ষণ আমার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলো। তারপরে কোনো কথা না বলে রিকশায় উঠে বসলো।

রিকশাচালককে বললাম, ভাই, মেয়েটি একা রাস্তার পাশে দাড়িয়ে ভিজছিল। তাছাড়া এখন আমার এক বন্ধুর বাসায় যাওয়া দরকার। ওনাকে ওনার বাসায় নামিয়ে দিলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

রিকশাচালক বললো, আমার পাওনা ভাড়া দিলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

ম্যানি ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে দিয়ে বললাম, ওনাকে ওনার বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

আমার টাকা দেয়া দেখে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে না সূচক কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই বললাম, ওনাকে ভাড়া করে এনেছিলাম। তাই আমার ভাড়াটা পরিশোধ করলাম। রিকশাচালককে হাতে ইশারা করলাম চলে যাওয়ার জন্য।

রিকশা চলতে শুরু করলো। দেখলাম মেয়েটি রিকশার পেছনের কাটা হুডের অংশ দিয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। এক সময় রিকশাটি ডানে মোড় নিতেই দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেল।

আমিও হাটা শুরু করলাম। কিছুটা আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, এতোগুলো কথা বললাম আর উত্তরে মেয়েটি একটি কথাও বললো না। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো কোনো বড়লোক বাপের অহংকারী মেয়ে হবে হয়তো।

মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী। সুন্দরী মেয়েরা অপরিচিত বা অল্প পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা কম বলে।

যাক, সেদিন হেটেই বাসায় চলে এলাম।

এদিকে বাবা মা আমাকে চেপে ধরলেন বিয়ে করানোর জন্য। ইতিমধ্যে দুটি মেয়েও দেখে ফেলেছি। কিন্তু কাউকেই আমার মনে ধরেনি। কাউকে দেখতে গেলে কেন যেন সেই মেয়েটির মুখচ্ছবি আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কাউকে কিছু বলতেও পারছিলাম না।

এর মধ্যে আমার ফুপাতো বোন রেশমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। বিয়ের আগের দিনই আত্মা সপরিবারে তার বোনের বাড়িতে হাজির। আমার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে হলো।

বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ আমার ভালো লাগে না। বিয়ে বাড়ির কোলাহল এড়ানোর জন্য পাশের বাড়ির এক ঘরের চৌকির মাঝে শুয়েছিলাম। তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। এক ভাবী এসে আমার চোখ-মুখ কাচা হলুদ দিয়ে ভরে দিল। হলুদ ধোয়ার জন্য কলপারে যেতেই সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা। আমি তো ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

আপনি!

আমার মুখ ভরতি হলুদ দেখে মেয়েটি ফিক করে হেসে দিল।

বুঝতে পারলাম আমাদের মতো সেও নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে। কল চেপে পানি তুলতে চাইলাম।

মেয়েটি দিল না। বুঝলাম সেদিনের উপকারের কিছুটা পরিশোধ করতে চাইছে।

মেয়েটি কল চেপে পানি তুলে দিল। তার তোলা পানিতে মুখ ধুয়ে চলে এলাম।

বিয়েবাড়িতে আসার পর থেকে কেন যেন বোরিং ফিল করছিলাম। কিন্তু তাকে দেখার পর থেকে আমার মনের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো। চেষ্টা করছিলাম তার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য। কিন্তু বিয়েবাড়ির এতো মানুষের মাঝে তা কোনোমতে সম্ভব নয়।

দুপুর দুইটার দিকে গাড়ি চেপে বর এসেছে, বাড়ির সবাই তখন বর আর বরের সঙ্গে আগত অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা গेटের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দেখলাম সেই মেয়েটি বারান্দায় একটা চেয়ারে একা বসে আছে। আমিও সেই সুযোগটাই নিলাম। কাছে গিয়ে বললাম, কেমন আছেন আপনি? সেদিন পথে আর কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

মেয়েটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে মাথা দুই দিকে নেড়ে জানালো যে, তার কোনো অসুবিধা হয়নি।

মেয়েটি কথা না বলাতে আমার ভেতরে একটু ক্রোধ জন্ম নিল। বললাম, আচ্ছা, সেদিন আমার পরিচয় দিলাম, আপনি একটা কথাও বলেননি। আজ দুবার আপনার সঙ্গে কথা বললাম, তাও আমার সঙ্গে আপনি একটা কথা বলেননি। এটা কি অহংকারের পর্যায় পড়ে না? জানেন নিশ্চয়ই অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করে না।

আমার এই কথায় মেয়েটির হাস্যোজ্জ্বল মুখটা হঠাৎ করে কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম তার দুটি চোখ পানিতে টলমল করছে। মেয়েটি চোখের পানিকে লুকানোর জন্য ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে এখান থেকে উঠে চলে গেল।

আমার বুকের ভেতরে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মেয়েটি আমার এই কথায় কষ্ট পেল? কি এমন রহস্য? আমাকে জানতেই হবে, কেন সে আমার সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু কিভাবে? কাউকে জিজ্ঞাসা করবো, পাছে যদি কেউ কিছু মনে করে বসে! বিয়েবাড়ির ভিড় কিছুটা কমার পর আমার বড় ভাবীকে বললাম যে, ভাবী, এখানে আমার একটা মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

ভাবী আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার মা-বাবাকে আমার পছন্দের কথা বললেন। একটু পরেই ভাবী এসে আমাকে জানালেন যে, মেয়েটির নাম কি? বাড়ি কোথায়?

বললাম, আমি মেয়েটির নাম জানি না। তাছাড়া তার বাড়ি কোথায় তাও জানি না।

ভাবী বললেন, নাম ঠিকানা না জেনে শুধু চোখের দেখাতেই ভালো লেগে গেছে? তা চলো দেখি কোথায় সে নন্দিনী যে আমার দেবরকে প্রথম দর্শনেই কুপোকাত করে ফেলেছে।

ভাবীর কথাই সত্যি, আমি তো সেই বৃষ্টিস্নাত প্রথম দেখাতেই তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। যদি তা-ই না হতো তবে কেন কোনো মেয়েকে দেখলে তার মুখায়ব আমার হৃদয়পটে ভেসে উঠবে।

ভাবী তাকে দেখার পর আমার কাছে এসে যা বললো তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভাবীর মুখের দিকে শুধু চেয়েই ছিলাম। কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না তখন।

ভাবী বললেন, মেয়েটি বোবা অর্থাৎ মেয়েটি বাক প্রতিবন্ধী।

এই কথা শোনার পর আমার ভেতরে যে কিছু একটা ওলট-পালট হয়েছে সেটা সম্ভবত ভাবী বুঝতে পেরেছিল। তাই তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, দেখি আব্বা-আম্মার সঙ্গে আলাপ করে, তারা কি বলেন।

ভাবী চলে যাওয়ার পর সেখানেই ঠায় দাড়িয়ে রইলাম। আমার চোখে বার বার ভেসে উঠতে লাগলো বৃষ্টিভেজা অসহায় মেয়েটির মুখচ্ছবি। আমার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

এর পরের ঘটনাগুলো আরো দ্রুত ঘটে গেল। বাবা আমার এই পছন্দের কথা শুনে রেগে একেবারে আশ্রয়। আমাকে এই বলে ভর্ৎসনা করলেন যে, আমাকে পড়ালেখা শিখিয়ে নাকি তিনি গাধা বানিয়েছেন। আরো অনেক কথা। এখানে আর বেশি লিখতে চাই না। শুধু আমাকে ভর্ৎসনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বিয়ে বাড়ির পাট চুকিয়ে সেদিনই সপরিবারে বাড়ির পথ ধরলেন। ফুপু অনেক করে বললেন অন্তত আজকের রাতটা থাকার জন্য। কিন্তু কারো কথাই তিনি শুনলেন না।

বাড়িতে এসে বাবাকে মা, ভাবী অনেক করে বোঝালেন যে, মেয়েটি বাক প্রতিবন্ধী ঠিক কিন্তু দেখতে তো সে খারাপ না।

কোনো কিছুতেই আমার বাপের মন তারা গলাতে পারেননি। আমিও যে আগ বাড়িয়ে কিছু একটা করবো তারও কোনো উপায় ছিল না।

অবশেষে আমি পরাজিত হলাম আমার অহংকারী পিতার কাছে। তিনি অর্থ ও সামাজিক মর্যাদায় সমাজে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। সমাজের বিভিন্ন অপরাধের বিচারকার্য যেখানে তিনি নিজ হস্তে করে থাকেন আজ সেই তিনিই অপরাধী আমার হৃদয়ের কাঠগড়ায়। মনুষ্যত্বের কাঠগড়ায় তার বিচার কে করবে?

ভগ্ন হৃদয়ে ছুটির নির্ধারিত তিন মাসের এক মাস হাতে রেখেই ফিরে এলাম লিবিয়াতে। এসেই চেষ্টা করলাম কাজের মাঝে ডুব দিতে। কিন্তু কিছুতেই সেই মেয়েটির কথা মন থেকে ভুলতে পারলাম না। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল, অপরাধীর মতো পালিয়ে এসেছি। শুধু আমার দিকটাই বলতে পারলাম। কিন্তু সেই বোবা মেয়েটির ভেতরে যে কষ্ট আমি দেখেছিলাম তা আমার লিখনির ভাষায় বলা সম্ভব নয়।

একদিন ফোন করলাম ফুপুদের বাসায়। ফোন করে রেশমার কাছ থেকে জেনেছিলাম যে, মেয়েটি রেশমার বান্ধবী। সে আরো বললো যে, মেয়েটি জন্মগতভাবে বোবা নয়। ছোটকালেই মেয়েটি অস্বাভাবিকভাবে কথা বলতো। তাই তার স্কুল শিক্ষক পিতা মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বেশ কিছু টাকা খরচ করে মেয়েকে অপারেশন করিয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসার জন্য মেয়েটি আজকের এই অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে।

মনের অজান্তে কখন যেন ফোনের রিসিভারটা রেখে দিলাম।

বুঝতে পারলাম, আমার চোখে গরম জলে টলমল করছে। কিছুক্ষণ নীরবে টেলিফোন বুথের ভেতর দাড়িয়ে থেকে যখন বের হলাম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার নিয়ন আলোয় একা পথ চলছি আর ভাবছি, আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীরা কতো অসহায়, সমাজে কতো নিচে তাদের স্থান। বুকের ভেতর থেকে বড় একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

দেশ থেকে আসার সময় বাবা বলেছিলেন যে, সময় সব ঠিক করে দেবে।

সত্যি কি সময় সব ঠিক করতে পেরেছে? আমার হৃদয়ে যে ক্ষত হয়েছিল তা সময়ের আবর্তনে শুকিয়ে গেছে ঠিক কিন্তু তার যে দাগ রয়ে গেছে তা কি কোনোদিন মুছতে পারবো?

জানি না তুমি কোথায় কিভাবে আছো? তবে দোয়া করি তুমি যেখানেই, যেভাবেই থাকো ভালো থেকে।

বেনগাজী, লিবিয়া থেকে

yeakubhasan2002@yahoo.com

একটু চাওয়া

আমি একজনের স্ত্রী, একজন স্নেহময়ী মা। পেশায় চিকিৎসক। সর্বোপরি একজন বেদনার্ত নারী। ছয় বছর ভালোবেসে ছাত্রী জীবনে পরিবারের অমতে পালিয়ে বিয়ে করেছি আমার ভালোবাসার মানুষকে।

বিয়ের প্রথম ছয় সাত মাস মনে হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী আমি। তারই ফল স্বরূপ পাচ মাসের মধ্যে আমার শরীরে নতুন এক ভালোবাসার জন্ম নিল। আমি মা হতে চললাম। কিন্তু আমার ভালোবাসার মানুষটা কেমন জানি পাল্টাতে শুরু করলো।

অনেক অশান্তির মধ্যেই জন্ম নিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার সন্তান। বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই পার করে এমবিবিএস পাস করলাম। চাকরি নিতেই সংসারে শুরু হলো আরো অশান্তি। অনেকবার ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু পারিনি সন্তানের মুখ চেয়ে।

এরই মাঝে একই হাসপাতালে চাকরির সুবাদে চার বছরের ছোট এক ডাক্তার কলিগ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। এক ১৪ ফেব্রুয়ারিতে মোবাইলে SMS দিল। Our relation is not only give & take, but more than that.

সেই থেকে শুরু। সে আমাকে শোনাতো কতো স্বপ্নের কথা, ভালোবাসার কথা। ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি অনেক জায়গা। ফোনে কথা বলেছি সারা রাত। আমার ভালোবাসাহীন ছয় বছরের সংসার জীবনে সে দিল নতুন ভালোবাসার ছোয়া। আমিও তার স্বপ্নের ভালোবাসার মাঝে হারিয়ে গেলাম। আবিষ্কার করলাম ওকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। আমার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে, আমার অস্তিত্বে সে মিশে গেছে।

ওকে আমার সমস্ত মন, প্রাণ, শরীর উজাড় করে দিয়েছি। কখনো মনে হয়নি পাপ করছি। মনে হতো দুই জন মানুষের মাঝে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে সব কিছু বৈধ, কোনো কিছুই পাপ নয়। এমনকি উপরওয়ালার কাছেও তা বৈধ।

তাই ওর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সপে দিতে দ্বিধা করতাম না। ওকে বলতাম, তুমি আমার জীবনের ক্যানসার সেল-এর মতো আমার মৃত্যুর পরও আমার সঙ্গেই থাকবে। তবুও মাঝে মধ্যে আমাদের বয়সের ব্যবধান, সমাজের ব্যবধানের কথা বললে সে হেসে আমার একত্রিশ বছরকে উল্টে তেরো এবং তার সাতাশ বছরকে উল্টে বাহাত্তর বানাতো।

সে সময় মনে হতো ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। আমার জন্য করতে পারে অনেক কিছুই। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য, একটু দেখার জন্য তার কি আকুলতা ছিল। একবারো মনে হয়নি এসবই মিথ্যা, অভিনয়, তার মোহ। কি বোকা আমি!

ছয় সাত মাস পর আবিষ্কার করলাম ও কেমন যেন পাল্টাতে শুরু করেছে। আগের মতো ফোন করলে তবেই শুধু কথা হয়। অথচ ওকে দেখার জন্য, ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য কি আকুলতা আমার।

ওকে বলতাম আমাদের সম্পর্কটা পরিণতিহীন। কখনো আমি তোমার বৌ হতে চাইবো না। কিন্তু আজীবন এভাবেই তোমায় ভালোবাসবো। আমার শুধু চাওয়া প্রতিদিন একবার আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলবে। সপ্তাহে একদিন আমাকে কিছুটা সময় দেবে এবং কখনো আমাকে মিথ্যা বলবে না।

খুব বেশি কি চাওয়া ছিল আমার?

কিন্তু আমার স্বপ্নের আমার ভালোবাসার এই মানুষটাও ধীরে ধীরে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এখন অন্য কোনো ডাক্তার এক মেয়েতে আসক্ত সে। আমার চাওয়া, আমার আবেগ এখন তার কাছে মূল্যহীন। এই ছয় সাত মাসে অনেকবার অনেক অপমান করে আমাদের সম্পর্ক শেষ করতে চেয়েছে।

কিন্তু আমি পারিনি ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে, ওকে ভুলে থাকতে। সংসার, সন্তান, চাকরি কোনোটাতেই মন বসাতে পারি না। তাই তো এতো অপমানের পরও নির্লজ্জের মতো ওর কাছে ছুটে যাই। ওকে যে আমি ভালোবাসি প্রচণ্ডভাবে।

তোমাকে জানাতে চাই যতোই কষ্ট, আঘাত, অপমান করো না কেন, আমি সারা জীবন তোমাকে ভালোবাসবো। তোমার মঙ্গল চাইবো। তবে অন্য কোনো নারীর এমন ক্ষতি তুমি করো না। এই একটা চাওয়া অন্তত রেখো।

ঠিকানা বিহীন

নীল বন্ধু

- তিথি

আমরা একই আকাশের নিচে, তবু তোর আর আমার মাঝে কতো দূরত্ব! আমরা একই বায়ুমণ্ডল থেকে শ্বাস নেই, তবু দেখা হয় না, হয় না কোনো কথা। কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না নীল!

নীল, তুই কি জানিস, আজও প্রতিটি ঈদ, ভালোবাসা দিবস, প্রতিটি বিকেল, সন্ধ্যা তোর অপেক্ষায় বসে থাকি? তোর ওপর আমার কোনো অভিমান নেই। কারণ বলার মতো আমার কিছুই নেই যা দিয়ে তোকে সুখী করতে পারতাম। তবে বিধাতার উপর খুব রাগ হয় আমার যদি তোর ও আমার পথ আলাদাই হবে তবে কেন গত পাচটি বছর আমরা একত্রে ছিলাম?

অনেক প্রশ্নের মতো জানি এ প্রশ্নের উত্তর তোর জানা নেই। জানিস নীল, মাঝে মধ্যে গভীর রাতে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন তোর মুখটা খুব মনে পড়ে। তখন মনে হয় সাগরের সবটুকু জল যেন আমার দু চোখে। বিধাতা কেন এত কষ্ট দিল আমাদের?

তুই কি আমাকে ভুলে গিয়েছিস নীল? ইউনিভার্সিটির চঞ্চলমুখর দিনের ফাকে কখনো কি তোর ছুটে আসতে ইচ্ছে করে না আমার কাছে? আমার এই ছোট পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হয় তোর শূন্যতা। যদিকে তাকাই, তোর নিপুণ হাতের স্পর্শে গড়া স্মৃতিগুলো কথা বলে আমার সঙ্গে। মাঝে মধ্যে মুক্তির স্বাদ পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু জানি আমার মুক্তি নেই, আছে শুধু স্মৃতি ঘেরা সোনালি অতীত।

সবাই অতীত ভুলে বর্তমান গড়ছে। ভবিষ্যতের জন্য অতীতের মাঝে জড়িয়ে আছি আষ্টেপৃষ্ঠে যা ভোলার ক্ষমতা আমার নেই। আমার কাছে বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই মূল্যহীন। তবু বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি, পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে তুই যেন ভালো থাকিস, সুখে থাকিস।

বোয়ালমারী, ফরিদপুর থেকে

Good Lodge

- শানু মজুমদার

বাড়িওয়ালারা সাধারণত ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিতে চায় না। তাই ব্যাচেলরদের পক্ষে ভালো বাসা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ১৯৮৮-এর কথা। গ্রামীণ ব্যাংকের চাকরি নিয়ে আমি তখন চট্টগ্রামে। এ বছরই আমার আবাল্য বন্ধু রণ বিসিএস করে চট্টগ্রামের এক নামি কলেজে জয়েন করলো। রণ-র একাডেমিক ক্যারিয়ার ভালো। চেহারাও ভালো। চৌকস। যদিও হাটুতে জোর একটু কম।

অনেক খোজাখুজির পর দুই বন্ধু মিলে বিবির হাটে তিন তলা ভবনের নিচ তলা ভাড়া নিলাম।

বিবির হাট চট্টগ্রামের একটি বিখ্যাত এলাকা। গরুর হাটের জন্য বিখ্যাত। কোরবানির সবচেয়ে দামি গরুটি প্রায় প্রতি বছরই বিবির হাটে বিক্রি হয়ে থাকে। সেই বিবির হাটে নিলাম বাসা।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা হোটেলের চালিয়ে দিই। প্রকৌশল টাইপের চাকরি আমার। প্রায় প্রতিদিনই রিমোট এলাকায় যেতে হয়। সকাল আটায় বাসা থেকে বের হয়ে ফিরতে ফিরতে রাত।

ব্যাচেলর মানেই বন্ধনহীন। ফু এডাল্ট। গতেঙ্গা সি বিচে কম দামে বিয়ার খাওয়া আমাকে পেয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধব মিলে রেলওয়ে মেনস স্টোর কিংবা হোটেল শাহজাহান-এর চম্পা বারেও আসব জমে। রুমমেট বন্ধুটি (রণ) আবার এসবে নেই। ভালো ছেলে সে, ফিডার খাওয়া ছেড়ে দেয়ার পর বড় হয়ে দুই একটা পেপসি ফানটা ছাড়া অন্য কিছু ছুয়েও দেখেনি। গুড বয়।

সেই গুড বয়ের একজন গুড ছাত্রী জোগাড় হয়ে গেল। সেই ছাত্রী আমাদের বাসা পর্যন্ত যাওয়া-আসা করে। দীর্ঘক্ষণ বাসায় গুরু-শিষ্য অবস্থান করে। এসবই আমার অজান্তে।

বিষয়টি আমার অগোচরে থাকলেও একদিন মহল্লার বখাটেরা হানা দিল। বেসামাল অবস্থায়। এর মধ্যে যুক্ত হলো ছাত্রীর অসংলগ্ন কথাবার্তা। ফলে চরম নাজেহাল হলো আমার বন্ধুটি এবং ঘটনাটি ঘটল আমার অনুপস্থিতিতে।

রাতে বাসায় ফেরার পর বন্ধুটি আমাকে সব খুলে বললো।

মেজাজটা বিগড়ে গেল। বন্ধুটির জন্য খারাপ লাগলো। বাসা বদলানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। এরই মধ্যে বাসায় চুরি হলো। আমার কিছু ইলেকট্রনিক্স গুডস নিয়ে গেল তালা ভেঙে।

আবার শুরু হলো বাসা খোজার পালা। বহুবিধ তিক্ত অভিজ্ঞতা আর ভাইভা দেয়ার পর মুরাদপুর হাউজিংয়ের ভেতরে একটি বাসা পেলাম। দোতলা। নিচতলায় বাড়িওয়ালা। আমরা দোতলায়। বেশ বড় বাসা। আমাদের দুজনের সঙ্গে যুক্ত হলো হেলাল, সৈয়দ এবং কাইয়ুম।

এখানে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে আফরোজা আসে কাইয়ুম সাহেবের কাছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প। আরেক গুড বয় হেলাল সাহেবের রুমে লাকিও মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে। অবস্থা দেখে বোঝা যায়, ডেটিং হোক আর প্রেমই হোক, এখানে অসুবিধা নেই। ফলে এটি হলো Good Lodge গুড লজ।

তারপরেও রণ কাউকে বাসায় আনছে না। ঘর পোড়া গরু সিদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। তার হয়েছে সেই অবস্থা।

বিকলে বাড়িওয়ালার মেয়েরা ছাদে ওঠে। ছোটটি অত্যন্ত সুন্দরী। বিয়ে হয়নি। অন্যটি শ্যামলা। প্রোষিতভর্তৃকা। তাকেই টার্গেট করলাম। কথা-টথা বলি দুজনে।

একদিন এক নিভৃত বিকেলে তাকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুমু খেললাম। ব্রেস্টে আকুলি-বিকুলি পঞ্চ আঙ্গুলের ঢেউ তুললাম।

সে চোখ বুঝে তা উপভোগ করলো।

পরের দিন রাতে নিচ তলা থেকে গামলা ভর্তি ভুনা খিচুড়ি এলো।

অন্যরা তো অবাক! এই আপ্যায়নের হেতু কি? কেউ ঠাওর করতে পারছে না।

আমার চরিত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারা। এবারেও তা-ই হলো। গতকালের বিষয়টি সবাইকে বললাম।

শুনে মহা হাস্যরোল।

হেলালের সহাস্য মন্তব্য, এক চুমুতে খিচুড়ি, তারপরে না জানি কি হজম করতে হয়।

এরপর থেকে চরম হতাশ এবং হা-পিত্যেশ শুরু হয়ে গেল সৈয়দের। ফ্লাইং ভালোবাসা তার পছন্দ।

সহকর্মী স্বস্তিকাদির মন্তব্য, সৈয়দসাহেবের চোখ লম্বা। সৈয়দ এখানে-ওখানে চোখ দিয়ে বসে। লম্বা, ফর্সা, রমণীমোহন চেহারা তার। অথচ তাকে চাপ না দিয়ে বাংলা পাচ মার্কা শানু মজুমদার খেলারাম বনে গেলে তা কি করে হয়! হা-পিত্যেশের কারণ এখানেই।

রাতে এডাল্ট সিনেমা-টিনেমা দেখে আমি এবং সৈয়দের ঘুমাতে দেরি হয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই দেরিতে ঘুম থেকে উঠতাম। অন্যরা আরলি টু বেড, আরলি টু রাইজ।

আমাদের বাসার বাউন্ডারি লাগোয়া কয়েকটি টিনশেড ছিল। সম্ভবত সেখানে গার্মেন্টেসের মহিলারা ভাড়া থাকতো। তাদের গোসলখানা ছিল গণ এবং টিন দিয়ে ঘেরা ছাদহীন। আমাদের আরলি রাইজাররা দোতালার ছাদ থেকে শুধু পেটিকোট পরা গোসলরত মহিলাদের অথহ ভরে দেখতো আমার আর সৈয়দের অজান্তে।

কেমন করে যেন বিষয়টি একদিন সৈয়দের নজরে এলো। এবং আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

দেখি আমাদের ছাদ থেকে গোসলরত মহিলাদের স্তনের বোটা পর্যন্ত দৃষ্ট হয়। পেটিকোট চেঞ্জের সময় আরো কিছু কিছু মেয়েলি অঙ্গ দৃষ্টিসীমার ভেতরে চলে আসে।

বিষয়টি আমার কাছে মোটেই উপভোগ্য হলো না। বরং মনটা খারাপ হয়ে গেল। অর্থনৈতিক দিক থেকে চাঙ্গা একটা সেষ্টরের কর্মীরা প্রাইভেসি বজায় রেখে গোসলটুকু করতে পারছে না, অথচ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে এর মালিকেরা।

গুড লজ-এর নিরাপদ আব্রুতে আমরা প্রায় দুই বছর ভালোবাসার সাম্পান ভাসিয়ে বেড়িয়েছি। আডা দিয়েছি, গল্প করেছি, প্রিয়তাকে জড়িয়ে চুমু খেয়েছি, রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছি, বুয়ার রান্না খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছি।

তারপর এক সময় জীবন আর সময়ের প্রয়োজনে গুড লজ থেকে আমরা একে একে ছিটকে পড়েছি। লাকীর সংগে বিয়ে হয়নি হেলালের। আফরোজাকে বিয়ে করি করি করেও করেনি কাইয়ুম। কথা নেই, বার্তা নেই বাবার পছন্দের রাখিকে বিয়ে করার পর রণ চলে গেল সিলেট। আমি ঢাকায়। ফেরদৌসীকে বিয়ে করেছিল সৈয়দ ঠিকই কিন্তু সবাইকে হতাশ করে ডিভোর্স হয়ে গেল বছর কয়েক যেতে না যেতেই।

সময় চলে যায়। কোনো কিছুর জন্যই তা থেমে থাকে না। কিন্তু পেছনে ফেলে আসা গুড লজ-টি আমাদের প্রথম জীবনের ভালোবাসার নিরাপদ চারণ ভূমি হয়ে থাকবে স্মৃতিতে আজীবন।

উত্তর কাফরুল, ঢাকা থেকে

পুতুল কাহিনী

পরিবারের চোখে লক্ষ্মী মেয়ে, শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্রী হলেই যে বিয়ের বাজারে আকর্ষণীয় পাত্রী হওয়া যায় না তার প্রমাণ আমি। চেহারাটা কালোই, চশমাটা ভালোই। মাস্টার্সে পড়ার সময় থেকেই পাত্র খোজা হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য সব দিক পাত্রদের পছন্দ হলেও মেয়ের চেহারা-সুরত আর পছন্দ হয় না।

ইতিমধ্যে মাস্টার্সের রেজাল্টে দেখা গেল অনার্সের মতো স্ট্যান্ড করেছি। এমন সময় জনৈক ইমিগ্রান্ট পাত্রের বাবা মা দেখে পছন্দ করলেন। যতোটা না চেহায়ায়, তারচেয়ে বেশি সদ্য বের হওয়া রেজাল্টে। পাত্রের সম্বন্ধে শুনলাম, বাবা মায়ের মতই তার মত। আরো শুনতে পেলাম, তিনি শুধু একটি ভালো মনের মেয়ে চান, চেহারা তার কাছে কোনো ব্যাপারই না।

ফোনে তার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো যেন কতো জনমের বন্ধু। খুব সুন্দর করে তার পরিবারের গল্প করেন, বিশেষ করে তার মায়ের কথা। খুব ভালো লাগতো শুনতে, ভাবতাম পৃথিবীতে এতো ভালো ছেলেও আছে!

কিন্তু হঠাৎ করে কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য পানচিনির পর বিয়েটা ভেঙে গেল। ততোদিনে শুধু ছবিতে দেখা লোকটিতে ভালোবাসতে শুরু করেছি। দুই পক্ষের বিরোধিতার কারণে কষ্ট হলেও তাকে চিঠিতে লিখতে বাধ্য হলাম যে, আমার পক্ষে আর আগানো সম্ভব না।

উত্তরে তিনি জানালেন অপেক্ষা করতে। তিনি এসে সব ঠিক করে দেবেন।

পরিবারের সবাইকে উপেক্ষা করে একজন অচেনা লোকের জন্য অপেক্ষা করলাম। তিনি সাত দিনের জন্য আমেরিকা থেকে উড়ে এলেন এবং সবাইকে মানিয়ে ফেললেন।

চোখের পানিগুলো যেন হাসি হয়ে গেল। ঠিক হলো এবার আকদ হবে, পরে তুলে নেয়া হবে।

আকদ হওয়ার পর ছিলেন দুইদিন।

কি যে ভালোবাসি তাকে!

এয়ারপোর্টে বিদায় দেয়ার সময় মনে হচ্ছিল এই বুঝি জীবনের শেষক্ষণ।

ফিরে এলাম বাপের বাড়ি। তাকে ছাড়া এতোটুকুও ভালো লাগে না। দিন যায়, রাত যায়। মনে হয় আমি যেন শুধু একটা দেহ। এই দেহে প্রাণ হচ্ছে আমার স্বামী। তার প্রতি বিশ্বাস আমার এতোই গভীর যে, মনে হয় দুনিয়া একদিকে আর সে আরেকদিকে।

সখাকে আপন মনে করে কোনো কথা বললে কিছু দিন পরে আবিষ্কার করি তার পরিবারের সবাই সেই কথা শুনেছে এবং ফলাফল স্বরূপ টিটকারী শুনছি।

সে টেলিফোনে একটা হাচি দিলে আমার মনে হয় কোনো প্রাণঘাতী রোগেই না সে আক্রান্ত আর আমার কোন অসুখ হয়েছে এটা বললে রক্ষাই নেই। অন্যের মুখে শুনি, সে বিএমডাবলিউ গাড়ি কিনেছে। আমাকে যে মাঝে মধ্যে যৎসামান্য হাত খরচ পাঠায় সেটা শাশুড়ির কাছ থেকে কি জন্য খরচ করবো তা বলে নিয়ে আসতে হয়।

ওকে ফোন করলে এতো অপমান করে যে, কেন ফোন করেছি। আমার সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগে না।

কিন্তু কি করবো, ওর কণ্ঠস্বর না শুনলে যে ঘুম আসে না আমার! শুধু ভাবি, এক সঙ্গে যখন থাকবো তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার কাছের সবাই ওর নামে বদনাম করে।

মুখপোড়াদের সঙ্গে রাত-দিন ঝগড়া করি। এতো বড় সাহস, আমার স্বামী দেবতার নামে বলে।

২০০৪-এ তিনি বাংলাদেশে পদধূলি দিলেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামীর ঘরে গেলাম। পুরো নয় দিন ছিলাম এক সঙ্গে। এই নয় দিনের কাহিনী লিখতে গেলে একটি উপন্যাস লেখা হয়ে যাবে। একেক দিন স্বামী দেবতা না জানি কোন যাদুমন্ত্রবলে ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন। সুস্থ, স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যে কি তা কিছুই বুঝিনি। রাতের পর রাত বিছানায় আমি একা। স্বামী তার মা বাবার ঘরে দরজা লাগিয়ে কি গল্প করছে কে জানে?

যাওবা বিছানায় আসে ...! যা হোক, সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কাহিনী না-ইবা লিখলাম।

যখনই বাইরে গিয়েছি, মিছিল গেছে সঙ্গে। আমাকে বসিয়ে শ্বশুরবাড়ির সবাই আমাকে ও আমার বাবা মাকে যৌতুকের জন্য যথেষ্ট অপমান করেছে। স্বামী আফসোস করেছেন তার খালাতো বোনকে বিয়ে করতে পারেনি বলে। আরো দুঃখ করেছেন, তার মা আমার জন্য ইনসিকিওরড ফিল করে।

করবে না আবার? আমি যদি তার ছেলে চুরি করে নিয়ে যাই!

সেই অনুভূতিগুলো লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না যখন তার হাত ধরতাম, কিভাবে ছাড়িয়ে নিতো। বসতাম তার পাশে, উঠে চলে যেতো। একটা বাচ্চার কথা বলতাম, বিরক্ত হতো। আর যাওয়ার আগে বললো, আমার মতো গেলো মেয়ে বিয়ে করে সে কতো বড় ভুল করেছে।

আমেরিকায় স্ট্যাটাসটাই বড়। তার ফাস্ট লাইফে আমি কতো বেমানান। হাই হিল পরে তো আমি হাটতেই পারি না, নাচবো কি করে?

এরপরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত। আমেরিকায় পৌঁছে সংবাদ দিল আমার সঙ্গে জীবন কাটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভালোবাসার শৃংখল থেকে সে মুক্তি চায়।

অনুগ্রহ প্রার্থনা করলাম তার কাছে। বললাম, যা খুশি করো। কিন্তু তালাক দিও না।

হায়! সে তো অরণ্যে রোদন।

তালাক শেষ পর্যন্ত আমিই দিয়েছি।

সৃষ্টিকর্তার অপ্রিয় কাজগুলোর মধ্যে একটি তালাক উচ্চারণ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, এর থেকে মরণও ভালো ছিল। এখন এই তালাকের কথাটা লিখতে গিয়েও চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

জানি না, আমার অপরাধ কি? ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তবে তা করেছি। আমার এই অপরাধে আজ আমার পরিবার তছনছ হয়ে যাচ্ছে। ঘরে-বাইরে এক অবর্ণনীয় কষ্টের জীবন যাপন করছি।

একদিন লাইফস্টাইল ক্লাসে যাযাদি সম্পাদক উপদেশ দিয়েছিলেন প্রতিদিন দুটো করে ইংরেজি শব্দ লিখতে। এতে করে বছরে জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পাবে ও উন্নতি হবে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে সুফলও পাওয়া যাবে।

তিনি বলতে পারেননি কি শিখলে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া যায়? শুধু পাওয়াই যায় না, ধরেও রাখা যায়?

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বারা বকুল

– অপূর্ব আকন্দ

তার সঙ্গে আমার পরিচয় হঠাৎ করেই আমার নানাবাড়িতে। আমার মামা একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। সে আসতো আমার মামার কাছে প্রাইভেট পড়তে। ও তখন পড়তো ক্লাস নাইনে, আর আমি সদ্য কলেজে উঠেছি।

মামা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেন ওকে কিছু অংক বুঝিয়ে দিই।

সায়েন্সের ছাত্র। তাছাড়াও আমি অংকে মোটামুটি ভালো ছিলাম।

যখন ওকে প্রথম দেখলাম, একেবারে চমকে গেলাম। তার চোখ দুটি এতো সুন্দর ছিল যে, মনে হয় না এমনটি আর কোথাও দেখেছি। শুধু কি তার চোখ! তার ঙ্র, তার চুল, তার আয়ত মুখমণ্ডল, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ কতোটা আকর্ষণীয় ছিল তা আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে পুরোপুরি বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তার সব কিছুই ছিল খুব আকর্ষণীয়।

আমি অংক কষাতাম। সে আমার দিকে চেয়ে থাকতো আর আমি পুলকিত হতাম। কারণ, সপ্তদর্শী একজন মেয়ে যদি কোনো যুবক ছেলের দিকে চেয়ে থাকে তাহলে তার যে কি অবস্থা তা শুধু ভুক্তভোগীরই পক্ষে বলা সম্ভব।

আমিও সুযোগ খুজতাম তাকে এক নজর দেখার জন্য। যেন ধরা পড়ে গেলে ভীষণ লজ্জা পাবো। আমি তার আশায় সারা দিন বসে থাকতাম। একটুও ভালো লাগতো না।

এভাবে একদিন বললাম, তুমি পড়তে আসতে এতো দেরি করো কেন?

সে বললো, না, আমি তো সময় মতোই আসি।

যুতসই উত্তর দিতে পারলাম না।

লক্ষ্য করলাম, সে মিটিমিটি হাসছে।

সেদিন যাবার সময়ও আমাকে ওদের পাড়ায় পূজার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেল।

নির্দিষ্ট দিনে গেলাম। ওদের বাড়িতে দেখলাম বিশাল আয়োজন। হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গা পূজা। বিশাল ব্যাপার। সুন্দর সব প্রতিমা। দেখলাম ওদের পাড়ায় খুব সুন্দর পূজা মন্ডপ।

ও আমার হৃদয়ে যে কখন স্থান করে নিয়েছে বুঝতে পারলাম না। নিজেকে কৃষ্ণ আর ওকে রাধা বলে কল্পনা করলাম।

হঠাৎ ওর কথায় বাস্তবে ফিরে এলাম।

ও হচ্ছে রাধা আর এ হচ্ছে কৃষ্ণ। ও রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী পুরোটা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললো।

এরপর আমার বাসায় ফিরে আসার সময় হলো।

ওর আশ্বা-মা আমার সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন।

ফেরার পথে ওকে বললাম, তুমি খুব সুন্দর, পূজা।

ও বললো, আপনিও সুন্দর।

বললাম, তুমি রাধার মতো সুন্দর।

ও বললো, আপনি কৃষ্ণের মতো।

আমার মনে হলো আমার কান দিয়ে ধোয়া বের হচ্ছে। খুব অবাক হলাম।

তারপর একদিন বলে ফেললাম, তুমি হিন্দু হতে গেলে কেন? তুমি হিন্দু না হলে ...।

ও বললো, না হলে কি, বলে ফেলেন?

না থাক। তাহলে তুমি রাগ করবে।

না। রাগ করবো না।

বললাম, তুমি হিন্দু না হয়ে মুসলমান হলে খুব ভালো হতো। তোমার মতো মেয়েকে ভালোবাসতে পারতাম।

এখন ভালোবাসলে কি কোনো দোষ আছে?

ধর্ম আমাদের দেশে খুব একটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার।

পূজা বললো, আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ। আমাদের বড় পরিচয় আমরা একই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।

ভালোবাসা হিন্দু-মুসলমান মানে না। ভালোবাসা মানব ধর্মেরই একটা অংশ বিশেষ মাত্র। আর ধর্ম

মহামানবদের তৈরি মানব কল্যাণের একটা উপকরণ। আপনাকে আমারও খুব ভালো লাগে এবং মনে হয়

আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আপনি না বললে আমিই আপনাকে বলতাম।

আমার নানাবাড়ি নাগর নদীর তীরে ঘেষেই। নদীর তীরে সারি সারি তাল গাছ, জাম গাছ, আম গাছ এবং সদ্য

লাগানো ইউক্যালিপটাস গাছ ওখানকার প্রকৃতিকে করেছে খুব সুন্দর। আমরা প্রতিদিন সেখানে ঘুরে বেড়াতে

লাগলাম এবং পূজাকে ভালোবাসতে লাগলাম। আমি ওকে আদর করে ডাকতাম বকুল। ও বকুল ফুলের

মতোই শুভ্র ও পবিত্র ছিল। মনে হতো ওকে একটুও কলুষতা স্পর্শ করেনি।

ও আমাকে প্রতিদিন সকালে একটি করে বকুল ফুলের মালা পরিয়ে দিতো।

আর আমি বিনিময়ে ওর গালে একে দিতাম দুই ঠোঁটের চিহ্ন।

চুমোয় চুমোয় ওর গাল লাল করে দিতাম। এভাবে চলছিল।

একদিন ওকে বললাম, বকুল, তোমার-আমার প্রেম এই সমাজ তো মেনে নেবে না।

ও সেদিন খুব কাদলো। বললো, আমি নাকি আসলে ওকে ভালোবাসি না। যদি ভালোবাসতাম তাহলে নাকি এ কথা বলতে পারতাম না।

ও বললো, তোমার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আমি যেকোনো সময় তোমার কাছে ছুটে আসবো। সেদিন দুজনে রক্ত দিয়ে লিখলাম যে, আমরা কোনোদিন আলাদা হবো না। আমাদের ভালোবাসার সাক্ষী স্বরূপ আজো নাগর নদীর মোদন ঘোষের বাকের ইউক্যালিপটাস গাছে আমাদের নাম লেখা আছে। আমরা আমাদের নাম রেখেছিলাম আমাদের হৃদয়ে, অন্তরে।

সেদিন বাসায় যাবার পর মামা আমাকে ডেকে বললেন, শোনো বাবা অপূর্ব, তোমার প্রতি তোমার আত্মা-মায়ের যেমন অনেক আশা ভরসা আছে, আমাদেরও আছে। তুমি এখানে এসেছো কয়েকদিন থাকবে। এখানে যদি একটা কিছু হয়ে যায় তোমার আত্মা-মায়ের কাছে আমি কি জবাব দেবো? কি শুনছি এসব তোমার নামে!

বললাম, আগামীকাল বাড়ি চলে যাবো।

মামা নীরসভাবে বললেন, তাই করো। পরে আবার সময় মতো এসো বেড়িয়ে যেও। এখন তোমার বাড়ি যাওয়াই উত্তম হবে।

সারা রাত দুই চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। শুধু তার চিন্তাই করলাম। ভুলতে পারলাম না একদিন আগে করা সেই রক্ত শপথের কথা।

পরদিন সকালে বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হলাম। কে জানি বললো, পূজা এসেছে। তোমাকে ডাকছে।

গেলাম আমার পূজার সামনে।

সে বললো, সব শুনেছি, তুমি আজ চলে যাবে। আর কোনোদিন আসবে না। আমার কোনো দাম তোমার কাছে নেই? ভুলে গেলে গতকালের শপথের কথা?

বললাম, কে বললো তোমাকে ভুলে গিয়েছি। অবশ্যই আসবো। আগামীকাল ভোর পাচটায় তৈরি থেকো, তোমাকে নিতে আসবো।

পরদিন ভোরে গেলাম। কিন্তু হায়! আমার বকুল, আমার পূজার দেখা পেলাম না।

পরে জানতে পারলাম, এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় আমার মামা ওই দিনের পরই ওর বাবাকে বলেন এক দিনের মধ্যে মেয়েকে বিয়ে দিতে অথবা ধাম ছেড়ে চলে যেতে।

সেই মতো আয়োজনও করেছিল ওর বাবা। কিন্তু আমার বকুল কি তা মেনে নিতে পারে! তাই তো সে ধুতরা ফুলের মাধ্যমেই মুক্তির স্বাদ নিয়েছিল।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

একুশ বছর

- মনি অধিকারী

কলিংবেলটা একটানা বেজেই যাচ্ছে। ছুটির দিন। বিকাল চারটা। খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে একটা বই পড়ছি।

উঠতে ইচ্ছা করছে না। বাসায় আর কেউ নেই। দ্বিতীয় প্রাণী কাজের বুয়া। সেও বেড়াতে বের হয়েছে।

উঠতে হলো। বিরামহীন কলিংবেলের বাজনা অসহ্য। দরজা খুলতেই দেখি সেই কালো মেয়েটা। নাম খুশি।

মহিলা কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্রী। অনেক দিন থেকেই আমাদের বাসায় আসা-যাওয়া করছে।

প্রায় এক মাস হলো আমার বড় বোন এসেছেন। এরপর থেকে তার আসা-যাওয়ার পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে।

দরজায় দাড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলো, আপা কোথায়?

আপা তো আজ সকালে চলে গেছেন।

শুনে খুব হতাশ হয়েছে মনে হলো। বাইরে দাড়িয়ে থেকেই বললো, কিছু মনে করবেন না, আপনার কাছ থেকে একটা বই নিতে এসেছি।

ভেতরে আসতে বললাম। কি বই দরকার নিয়ে যান। বাসায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

আমি শুধু একটা বই নিয়ে চলে যাবো বলতে বলতে আমার সঙ্গেই আমার পড়ার ঘরে এলো। বসলো। অনেকক্ষণ বই নাড়াচাড়া করলো। আমাকে হঠাৎ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো আপা আবার আসবেন কি না? একা থাকতে আমার কেমন লাগে। কাজের বুয়া কোথায় গেছে ইত্যাদি।

আমার বিরক্ত লাগছিল। প্রায় পৌনে এক ঘন্টা পর তার পছন্দ মারফিক একটা বই নিয়ে চলে গেল।

এ বাসায় এসেছি প্রায় ছয় মাস। বিরাট বাড়ি। একাই থাকি। কিছু দিন আমার ছোট ভাই ছিল। এখন শুধু একজন কাজের বুয়া ছাড়া আর কেউ নেই।

খুশি নামের এই মেয়েটি প্রায়ই আসে। প্রথম দিন এসেছিল পাসের বাসার হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে। হাসিনা এখানের কোনো স্কুলের শিক্ষক।

হাসিনা পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বান্ধবী খুশি। কলেজে পড়ে। এখানেই এদের বাড়ি।

খুশি কোনো কথা বলেনি।

আরো কয়েকবার আসার পর আমার সঙ্গে কিছু কিছু কথা হতো।

আমার কোনো উৎসাহ নেই খুশির সঙ্গে আলাপ করার। খুশির গায়ের রঙ কালো। তবে দেখতে খুবই সুন্দর। স্বাস্থ্য ভালো। চলনে-বলনে খুবই ভদ্র। যতোক্ষণ থাকে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে সেই জানে। আমার ভালো লাগে না। আমি চাইনা খুশি যখন-তখন এখানে আসুক। আশপাশের লোকজন কি ভাববে! তাকে নিষেধও করতে পারিনা। কখনো কখনো আবার অফিসে টেলিফোন করে।

একদিন এক ভদ্রলোক আমার অফিসে এলেন। পরিচয় দিলেন তিনি খুশির দুলাভাই। এখানের কোনো অফিসে চাকরি করেন। আমাকে বার বার অনুরোধ করলেন, একদিন যেন তাদের বাসায় যাই।

কয়েক দিন পরেই নতুন বাসায় এলাম। দোতলা বাড়ি। আমি নিচ তলায় থাকি।

বাড়িওয়ালা থাকেন দোতলায়।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই খুশি এসে হাজির। সঙ্গে তার ছোট বোন।

ছুটির দিন ঘরেই ছিলাম।

খুশি প্রায় এক ঘন্টা থাকলো। বাড়িওয়ালার খোজ খবর নিল। আমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, এখানে আসার আগে একবার তো তাকে জানাতেও পারতাম।

খুশির দুলাভাইয়ের অনুরোধে একদিন তার বাসায় গেলাম। খুশিদের বাসার কাছেই এ বাসা। খুশি আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। অনেক খাওয়া-দাওয়া হলো। অনেক কথা হলো।

আপা-দুলাভাই দুজনেই জানতে চান খুশির ব্যাপারে আমি কি ভাবছি। এ মন্তব্যে কোনো কথাই বলতে পারিনি। আমার একটা অতীত আছে। তার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু বলতে পারবো না। খুশিকে এ কথা আগেই বলেছি। পথে নামতেই আমার সঙ্গে খুশি অনেক পথ এলো। বার বার অনুরোধ করলো তাদের বাড়িতে একবার যাওয়া জন্য।

আমি যাইনি।

কয়েকদিন পরেই খুশির এটা চিঠি পেলাম। আমাকে তুমি সম্বোধন করে অনেক কথা লিখেছে। সে আমাকে ভালোবাসে। আমাকে না পেলে আত্মঘাতী হবে। আমি যেন চিঠি দিয়ে আমার মনোভাব জানিয়ে দিই।

চিঠিটা যত্ন করে রেখে দিলাম। কিন্তু কোনো উত্তর দিলাম না।

পনেরো দিন পরে সে এলো।

আমি চিঠির কথা কিছু বলিনি এবং সেও জিজ্ঞাসা করেনি।

এক মাস পর আবার একটা চিঠি পেলাম। তার বান্ধবীরা আমার কথা বলে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তার আত্মীয়-স্বজনরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়।

আমি আগের মতোই নীরব থেকেছি।

এর কিছু দিন পরে কয়েকটি ছেলে আমার অফিসে এসে খুশির ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কিছু কথা বললো। তাদের শেষ কথা, আমি যেন খুশিকে বিয়ে করি।

পরের দিনই খুশি এলো। বললো, আমি খুবই দুঃখিত। ওই ছেলেগুলোকে চিনি। তবে তাদের আমি পাঠাইনি। তাদের বলেছি, আমার ব্যাপার আমাকেই সামলাতে দাও। তোমরা এর মধ্যে এসো না।

এতো ঘটনার পর এখানে আর থাকা ঠিক নয়। অনেক দিন তো হলো। এবার বিদায়ের পালা। বদলি হয়ে ঢাকায় চলে এলাম। কাউকে জানাইনি, এক রকম পালিয়েই এসেছি।

অনেক বছর কেটে গিয়েছে। হয়েছে অনেক ভাঙাগড়া। ঢাকা থেকে রাজশাহী যাচ্ছি বাসে। আরিচা ঘাটে বাস ফেরিতে উঠলো। যাবে নগরবাড়ি ঘাট। বাস, ট্রাক, প্রাইভেট মিলে অনেক গাড়ি। নগরবাড়ি ঘাটে পৌছাতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগবে। দীর্ঘ সময়। বাসে বসে ভাবছিলাম কতো দিন পরে আবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি। একুশ বছর আগে পাবনা থেকে চলে এসেছি। এর মধ্যে ওদিকে আর যাওয়া হয়নি।

বাস থেকে নামলাম। এদিক-ওদিক হাটছি। ফেরিওয়ালাদের অত্যাচার। বাসের আড়ালে আবার জুয়া খেলাও চলছে। দূরে দাড়িয়ে দেখলাম কতো সহজে সরল লোকগুলো জুয়াড়িদের কাছে সর্বস্ব হারিয়ে পালিয়ে আসছে।

চা খাবো ভেবে ফেরির উপর তলায় এলাম। ক্যান্টিনের কাছেই এক মহিলা বসে আছেন। পাশেই তার ছেলে কোক খাচ্ছে। মহিলাকে খুবই পরিচিত মনে হলো। কাছে এগোতেই চিনতে পারলাম। এ খুশি। অনেক মোটা হয়েছে। মাথায় সেই চুলের বাহার আর নেই। বয়সের ছাপ শরীরের অন্যান্য জায়গায় পড়লেও মুখের লাবণ্য আগের মতোই আছে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম। এক সময় নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এলাম। লজ্জা লাগছিল। একদিন তাকে না জানিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমাকে সে নিশ্চয়ই ভীষণ, কাপুরুষ, অপদার্থ বলেই ধরে নিয়েছে।

কাছ ঘেষে দাড়াতেই চোখ তুলে তাকিয়েই চিৎকার করে বলে উঠলো, আরে, মনিভাই না? নিশ্চয়ই আপনি মনিভাই। কতোদিন পরে দেখলাম। কতোদিন বলেন তো?

একুশ বছর। বললাম।

তা হবে।

সেই কতোদিনের কথা। আমি তো আপনাকে দেখেই চিনেছি। আপনি কি আমাকে চিনতে পোরেছেন? আমার চেহারা কি আপনার মনে আছে? মনে না থাকারই তো কথা। কোনোদিন তো চোখ তুলে ভালো করে তাকিয়েও দেখেননি। তো এখন কোথায় আছেন, কোথায় যাচ্ছেন, ছেলেমেয়ে কোথায়? ভাবীকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ভাবী দেখতে নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর। আপনি না বললেও জেনেছি, ভাবী পাবনারই মেয়ে।

একভাবে কথা বলে যাচ্ছে। কোনো বিরতি নেই।

ছেলেটা একবার আমার দিকে আর একবার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। অচেনা, অজানা লোককে দেখে মায়ের এতো উচ্ছ্বাস তার কাছে অবাক লাগছে।

তার সামনেই বসলাম। ছেলেকে কাছে ডাকলাম। কাছে এলো।

খুশি পরিচয় করিয়ে দিল, তিনি তোমার মামা হন। এর বড় দুটি মেয়ে। তারা কলেজে পড়ে।

ছেলেটা দেখতে খুবই সুন্দর, মিষ্টি চেহারা, জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি বাবু?

জাহিদ হাসান। আম্মু আমাকে মণি বলে ডাকে।

বিরাত একটা ধাক্কা খেলাম। ভুল শুনলাম না তো!

দেখলাম খুশি মাথা নিচু করে আছে।

কিছুতেই মেলাতে পারছি না, যে তাকে দিনের পর দিন হেনস্তা করেছে, অবহেলা করেছে তাকেই কি না নিজের সন্তানের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছে। একি প্রতিশোধ, নাকি স্মৃতিচারণ!

খুশিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো?

ভালো আছি। খুব ভালো আছি। জানেন, আমার সাহেবও আমাদের সঙ্গে আছেন। নিচে গেছেন। এখনি এসে যাবেন। তিনি পাবনা কলেজের শিক্ষক। আমরা কলেজের কাছেই থাকি। আসুন না একবার বেড়াতে। ভয় নেই। একুশ বছর অনেক সময়। এখন আমি তিন ছেলেমেয়ের মা। শিগগিরই মেয়ের বিয়ে দেবো। কথা বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পরে বললো, পাবনার কথা কি আপনার মনে আছে? তিন বছরের কতো স্মৃতি যখন মনে হয়, ভীষণ লজ্জা পাই। আপনাকে কতোভাবেই না বিরক্ত করেছি। আমার জন্যে আপনি অনেক বদনামও কুড়িয়েছেন। কেন এমন হয় বলুন তো? আমি তো প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিলাম, আপনি আমাকে পছন্দ করেন না। মজার ব্যাপার কি জানেন? যতোই আপনি আমাকে অবহেলা করতেন ততোই আপনাকে পাওয়ার জন্য আমার জেদ বেড়ে যেতো। কি না করেছি!

দিনের পর দিন আপনার নির্জন-নিরালা বাসায় একাকী গিয়েছি। বাসায় আপনিও একা। অধিকাংশ সময় কাজের ব্যাঘাত থাকতো না। আপনি ভয়ে ভয়ে বই পড়ছেন, আমি আপনার মাথার পাশে চেয়ারে বসে আছি আর ভাবছি কখন আপনার মনোযোগ বই থেকে আমার দিকে ঘুরবে। আপনার বাড়িওয়ালার মেয়েরা বার বার এসে দেখে যাচ্ছে এবং আজবাজে মন্তব্য করছে। আমার এদিকে কোনো দ্রুতপন নেই। সময় বয়ে যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। আপনি বলতেন, খুশি, সন্ধ্যা হয়ে এলো, এবার বাড়ি যান। আমার হাতে একটা বই ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, ভালো বই, পড়ে দেখতে পারেন।

বই আনতাম। কিন্তু পড়া আর হয়ে উঠতো না। তিনটি বছর এভাবেই পার হয়ে গেল।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবারই জিজ্ঞাসা – খুশি, তোর কি হয়েছে? কি উত্তর দেবো! আসলে আমার তো কিছু হয়নি। মনিভাই বলেন তো, এটা কি ভালোবাসা, নাকি মোহ? ভালোবাসা কি কখনো একতরফা হয়? মনিভাই একটা সত্য কথা বলবেন? তিন বছরে কি আপনার হৃদয়ে আমি সামান্য একটা আচড়ও কাটতে পারিনি? ভালোবাসা নয়, সামান্য একটু ভালো লাগা? আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। খুশির চোখে পানি।

খুশি তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল কি না, তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়ে এখনো বাজে কি না একুশ বছর পর সে কথা জেনে কি হবে? তবে তোমার কি মনে পড়ে, আমি অনেকবার বলেছি আমার একটা অতীত আছে। পাচ বছর একজনের পথ চেয়ে আছি, কখন সে আমায় ডাকবে। এটা ঠিক, সেই একজনের ডাকের অপেক্ষায় থেকে থেকে অনেক শিউলী, বকুল, হাস্মাহেনাকে অনাদরে, অবহেলায় হারিয়েছি। খুশি, তুমি অনেক সুখে আছো।

খুশি সহসাই বললো, আপনার কি তাই মনে হয়?

হ্যাঁ, আমার সে রকমই মনে হয়। যদিও তোমার স্বামীর পরিচয় এখনো পাইনি।

আমার স্বামী খুবই ভালো মানুষ। আমার ছেলেমেয়েরা তাদের বাবার মতো।

এমনি সময়ে এক ভদ্রলোক এসে খুশির পাশে বসলেন।

খুশি পরিচয় করিয়ে দিল, তিনিই ইকবাল হোসেন, আমার স্বামী। আর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তিনি আমাদের মনিভাই।

আমার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক যেন একটু চমকে গেলেন। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন, আপনার নাম অনেক শুনেছি। দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। তবে এভাবে দেখা হবে ভাবতে পারিনি। চায়ের কথা বললেন।

আপত্তি করলাম, চা তো এই মাত্র খেলাম। আবার কি।

ইকবাল সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, সে তো খুশি তার পুরনো বন্ধুকে খাইয়েছে। তার স্বামী হিসেবে আমারও তো একটা কর্তব্য আছে।

ইকবাল সাহেবের কথা শুনে মনে হলো তিনি আমাকে শুধু জানেন না, ভালোভাবেই জানেন।

খুশি তার ছেলেকে নিয়ে বাইরে গেল। ইকবাল সাহেবকে বলে গেল, মনিকে নিয়ে টয়লেটে যাচ্ছি, তোমরা কথা বলো।

ইকবাল সাহেব সিগারেট জ্বালালেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো খুবই আদর্শবান লোক, সামান্য একটু ধূমপানও করেন না। সিগারেট টানতে টানতে বললেন, মনিভাই আপনার আর খুশির বিয়োগান্ত নাটকের কাহিনী কিছু কিছু শুনেছি। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হলো, খুশিই আমাকে সব কথা বলেছে। খুশির সঙ্গে আমার পারিবারিকভাবে সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়। যদিও দুই পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই আত্মীয়তা ছিল।

বিয়ের দ্বিতীয় রাতেই খুশি আমাকে বলে, তোমাকে একটা কথা না জানাতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। নিজের কাছে নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হচ্ছে।

আমি শুনতে চাইনি। তবুও তিন বছরের প্রতিটি ঘটনা একে একে আমাকে শুনিয়েছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করেননি, এই ঘটনা তুমি আমাকে বললে কেন?

খুশির উত্তর, এ ঘটনা এখানকার অনেকেই জানে এবং তোমার কানে অবশ্যই আসবে। তখন ঘটনার অনেক ডালপালাও গজাবে। তাই সত্য ঘটনাটা তোমাকে জানালাম যাতে আমাদের মধ্যে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

সব শুনে খুশিকে একটা প্রশ্নই করেছি, মনিভাইকে তুমি ক্ষমা করতে পেরেছো?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, না, ক্ষমা তাকে কোনোদিন করতে পারবো না। সে আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসাকে ছেড়া কাগজের টুকরোর মতো ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আমার নারীত্বকে চরমভাবে অপমান করেছে। কিভাবে তাকে ক্ষমা করি!

তখন তাকে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তবে এ কথা ঠিক, মনিভাই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেনি। প্রথম থেকেই সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এবং তার কারণও বলেছিল। তার প্রতি ওই সময়ে এতো দুর্বল ছিলাম যদি সে ইচ্ছে করতো, আমার অনেক ক্ষতি করতে পারতো। আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারতাম না।

ইকবাল সাহেবকে ছোট একটা প্রশ্ন করলাম, আপনি কি খুশির সব কথা বিশ্বাস করেন?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, হ্যাঁ করি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বুঝতে পারছি খুশিকে বিশ্বাস করে ভুল করিনি। আমাদের প্রথম দুটি সন্তান মেয়ে। আমি বলেছিলাম, আর দরকার নেই। খুশি শোনেনি। তার একটা ছেলে দরকার। মেয়েদের এবং ছেলের নাম আমিই রেখেছি।

ছেলের জন্মের কয়েকদিন পরেই খুশি বললো, ছেলের নাম যাই রাখো না কেন আমি তাকে মণি বলেই ডাকবো।

কেউ না জানলেও আমি তো জানি, এ নামের উৎস কোথায় এবং এটাও বুঝতে পারছি, মুখে যাই বলুক, মনিভাইকে সে এখনো ভুলতে পারেনি।

ছেলেকে নিয়ে খুশি ফিরে এলো। স্বামীকে বললো, চলো নিচে যাই। আমরা বোধহয় ঘাটে পৌঁছে গেছি। সবাই মিলে নিচে নামছি। প্রথমে ইকবাল সাহেব এবং ছেলে, তার পেছনে খুশি।

আমিও এদের পেছনে আসছি। ইকবাল সাহেব শুনতে না পান এভাবে খুশিকে বললাম, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না।

বেশ তো বলুন না। খুশি হাসতে হাসতে বললো।

তুমি ছেলেকে এ নামে ডাকো কেন? এটা কি আমার প্রতি তোমার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ, নাকি স্মৃতিচারণ। কথাটা শুনে খুশি গম্ভীর হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বললো, নিজের সন্তানকে কি কেউ ঘৃণা করে।

আমরা বাসের কাছাকাছি চলে এসেছি।

ইকবাল সাহেব ছেলেকে নিয়ে বাসে উঠে পড়েছেন।

হঠাৎ খুশি আমার কাছ ঘেষে দাড়িয়ে কানে কানে বলার মতো করে বললো, মনিভাই, একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করে, সত্যি উত্তর দেবেন?

বেশ তো বলো না। জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলবো।

অনেক দ্বিধা, অনেক সঙ্কোচ নিয়ে বললো, মনিভাই, যার জন্যে এতো কিছু করলেন, যতদূর জানি, আমার মতো আরো কয়েকটি মেয়েকে কাদালেন, সে আপনার জীবনে এলো না কেন?

কি উত্তর দেবো? এর উত্তর তো আমিই জানি না। শুধু বললাম, সবাই কি সব কিছু পায়? পায় না। আমি সেই না পাওয়াদের দলে।

যাত্রীরা সবাই নিজ নিজ বসে উঠে পড়েছে।

আমিও দৌড়ে আমার বাসে উঠলাম।

বাসগুলো একে একে ফেরি থেকে নেমে রাস্তায় উঠলো। এবার যার যার গন্তব্যে রওনা হবে।

বাসে উঠে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম তারা কতোদূরে। দেখলাম, তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমিই শুধু পেছনে পড়ে আছি।

গাড়ির ক্যাসেটে তখন গান বাজছে *ভুল সবই ভুল, এ জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সে ভুল...*। মনে হচ্ছে শিল্পী আমাকে করুণা করেই গানটি গেয়ে যাচ্ছেন।

এলিফেন্ট রোড, ঢাকা থেকে

মিসেস MO

- জেসি

একদিন স্কুলে যেতে টাকা ভাংতি করার জন্য তাড়াতাড়ি দোকানে যাই এবং চুইয়িং গাম কিনি। তখন অতিরিক্ত চুইয়িং গাম খেতাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম দোকানের বাইরে চশমা পরা একটি ছেলে দাড়িয়ে আছে। ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে খুব হাসছিল। আমার তখন এতো মাথা খারাপ হলো, ইচ্ছে করছিল তার চশমা ভেঙে দিই। কিন্তু কিছু বললাম না। মাথা নিচু করে সোজা চলে আসি।

রিকশায় উঠে মাত্র চুইয়িং গাম মুখে দেবো, এমন সময় মনে পড়ে এখন রমজান মাস এবং আমি রোজা রেখেছি। তখন আমার নিজেরই হাসি আসছিল।

এভাবে আরো অনেক দিন চশমা পরা ছেলেটাকে আমাদের এলাকায় দেখেছিলাম। প্রায়ই ঘর থেকে বের হলে তার সঙ্গে দেখা হতো। ছেলেটি সাইজে বেশি মোটা না হলেও আমরা দুই বোন মিলে তার নাম রাখি মটু।

একদিন আমরা মার্কেটে যাই। হাটতে হাটতে হঠাৎ সামনে দেখলাম লাল টি-শার্ট পরা একটি ছেলে আসছে। ছেলেটি আমাদের থেকে অনেক দূরে ছিল তবুও ছেলেটাকে খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। কাছে এলে দেখতে পাই, আমাদের এলাকার সেই মটু। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে ফেলি।

সে আমাদের থেকে একটু দূরে গেলে পেছন ফিরে তার দিকে তাকাই। দেখতে পেলাম সেও তাকিয়ে আছে। তার মুখে সেই প্রথম দিনের হাসি।

সেই হাসি দেখে মাথাটা আবার খারাপ হয়ে গেল। কোনো মতে নিজেকে সামলে সামনের দিকে হাটতে থাকি। তবুও কেন যেন তাকেই দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আর দেখা হলো না।

এরপর অনেক দিন মটুকে দেখলাম না। হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম আমাদের স্কুলের সামনে ব্যাগ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আমি তো দেখে অবাক। মনে করেছিলাম আমার পেছন পেছন এসেছে। পরে জানতে পারি আমাদের স্কুলেই পড়ে।

আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগলো, নাম কি তার? কিসে পড়ে? পরে জানতে পারলাম, তার নাম ইমন এবং ক্লাস এইটে পড়ে।

আস্তে আস্তে তার ওপর রাগ কমতে থাকলো।

সে অনেক সময় ইশারায় কিছু বলার চেষ্টা করতো।

কিন্তু কিছুই বুঝতাম না।

আমরা দুই বোন মিলে আবার তার নাম মটু থেকে সংক্ষেপ করে *MO* রাখি।

আমার বাবাবীরা দুইমি করে আমাকে *মিসেস MO* ডাকতো।

তখন তাদের ওপর খুব রাগ হতো। পরে নিজেই নিজেকে *মিসেস MO* ডাকতাম। বাইরে তার সঙ্গে দেখা হলেই সে কথা বলার চেষ্টা করতো। কখনো নাম জিজ্ঞাসা করতো আবার কখনো কোন ক্লাসে পড়ি তা জিজ্ঞাসা করতো।

কখনো কিছু বলতাম না।

এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। এক সময় সে এসএসসি পরীক্ষা দিল। আমিও পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। তখন আমাদের আর তেমন দেখা হতো না। মাঝে মাঝে দেখা হতো। কিন্তু মনে হতো যেন এখন আমার প্রতি তার কোনো আঘাত নেই।

এক সময় সে কলেজে ভর্তি হলো। কোন কলেজে পড়তো কিছুই জানতাম না।

এক বছর পর আমিও ভর্তি হলাম কলেজে। আমি যেন তাকে ভুলতেই পারছিলাম না। কলেজে প্রায় এক মাস ক্লাস করলাম। কলেজ জীবন খুবই পানসে ও বিরক্তিকর মনে হতো।

একদিন তাড়াতাড়ি করে কলেজে ঢুকছিলাম। দূর থেকে একটি ছেলে আসছিল লাল টি-শার্ট পরা। দেখতে খুব চেনা পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। কাছে এলে দেখতে পাই মুখে সেই একই হাসি।

চিন্তা করলাম, একি সেই MO? কিন্তু চশমা কোথায়? মাথা নিচু করে সোজা হেটে চলে যাই।
পরদিন দেখি ছেলেটি সেই একই জায়গায় দাড়ানো। হঠাৎ জেসি বলে আমাকে ডাক দিলো।
আমি তো অবাক হয়ে যাই। ইমন আমার নাম জানলো কি করে!
সেদিন ছিল তার সঙ্গে প্রথম কথা। আমরা দুজন একই কলেজেই পড়ি।
আস্তু আস্তু আমাদের দেখা হতে শুরু হলো। অনেক সময় আমরা ক্লাস ফাকি দিয়ে রেস্টুরেন্ট বা পার্কে চলে যেতাম।

সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। সে আমাকে একটি উপহার দেয় এবং বাসায় এসে খুলতে বলে।
আমি ঠিক ঠিক সেটা বাসায় এসে খুলি এবং দেখতে পাই, খুব সুন্দর একটা ডায়রি। ডায়রিটা খুললাম এবং দেখতে পেলাম সম্পূর্ণ ডায়রি লেখায় ভর্তি। কিন্তু কি লেখা এতে? ডায়রিটা পড়ে দেখলাম। পড়ে তো আকাশ থেকে পড়লাম। আমাদের প্রথম দেখা থেকে শুরু করে প্রতি দিনের কথা সেই ডায়রিতে লেখা। ডায়রির শেষ পাতায় একটি বাক্য লেখা ছিল এবং সেটি ছিল –

Do you love me? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

পরদিন কলেজে গিয়েই তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই। উত্তরটি ছিল, *হ্যাঁ*।

এখন সত্যিই মিসেস **MO** হয়েছি। আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় দেড় বছর। কখনো বুঝতেই পারিনি তার প্রথম দিনের হাসিটা ঘৃণা করতাম, না ভালোবাসতাম! এখন বুঝতে পারছি যে, তার সেই হাসিটা খুব ভালোবাসি।

এমন একজন সঙ্গী পেয়েছি যে আমাকে প্রেমিক, স্বামী এবং বন্ধুর মতো ভালোবাসে।

চট্টগ্রাম থেকে

স্যার

– এন এস ইমা

বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। সেই সুবাদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি।

১৯৯৫ সালে দেশের দক্ষিণে বরিশাল জেলার মুলাদী থানায় আমার বাবা বদলি হলেন। আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্রী। আমাকে মুলাদী এম জে হাই স্কুলে ভর্তি করানো হলো। আমি অনেক ভাগ্যবতী বলেই হয়তো ওই স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। তা অবশ্য আবার আমার বাবার চাকরির সুবাদের কারণেই।

নিজেকে ভাগ্যবতী বলছি এ জন্যই যে, ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত ওই স্কুলে বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর পড়াশোনা করেছিলেন। ক্লাস নাইন ও টেনের বাংলা বইয়ে সেই স্কুলের নামটিও স্থান পেয়েছে।

আজ যার সম্বন্ধে লিখতে বসেছি তিনি আমাকে কোনো কিছু লেখার জন্য প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিতেন।

১৯৯৫ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে ক্লাস এইটের ক্লাসরুমে বসে ছিলাম। বান্ধবীর সঙ্গে স্কুলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। হঠাৎ করেই সবাই দাড়িয়ে পড়লো।

পেছনে বসার কারণে কে ক্লাস ঢুকেছেন তা দেখতে পেলাম না। সবাই যখন বসলো, তখন দেখলাম খাটো করে আধাকাচা চাপদাড়ি, গোল কাচের ফ্রেমের চশমা, শাদা শার্ট, কালো প্যান্ট পরিহিত মধ্য বয়স্ক একজন শিক্ষক।

পাশে বসা আমার বান্ধবী আমাকে খোঁচা মেরে বললো, *এই সেই খলিলস্যার*।

শুনেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি নতুন এসেছি, আমাকে না জানি কি বলে বসেন! তিনি অসম্ভব একজন রাগী শিক্ষক ছিলেন (পরবর্তী সময়ে তা আর মনে হয়নি)।

শত কল্পনা-জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পেছনে বসা চশমা পরা মেয়েটি দাড়াও তো।

প্রথম পরিচয়টা স্যারের সঙ্গে আমার এ রকমই ছিল। আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলাম, তিনি যেন আমাদের ক্লাস না নেন।

আমার ডাকটা আল্লাহ শুনেছিল! ক্লাস নাইনে ওঠার পরই শুনতে পেলাম খলিলস্যার আমাদের ক্লাস টিচার। তিনি ক্লাস নাইন ও টেনের বাংলা, ইংরেজি দুটি সাবজেক্টই পড়াবেন।

এমনিতেই ক্লাস করা দুষ্কর, তার মধ্যে আবার ক্লাস টিচার। ভয়-ভীতি আর শংকা নিয়ে ক্লাস করতে লাগলাম। স্যারকে যতো দেখতে লাগলাম ততোই অবাক হলাম। কি সুন্দর করে বোঝাতেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। যেমন বাংলা তেমনি ইংরেজি। এক কথায় অসাধারণ।

ক্লাস টেনে ওঠার পর আস্তে আস্তে স্যারের সান্নিধ্যে আসতে লাগলাম।

টেস্ট পরীক্ষার পর আমাকে বাসায় কিছুটা সময় দেয়ার জন্য আমার বাবা অনুরোধ করলেন স্যারকে।

বাসায় আসার সুবিধার্থে স্যারের প্রতি আমার ভয়, আড়ষ্টতা দূর হতে লাগলো এবং স্যারকেও অন্যভাবে চিনতে লাগলাম।

আমাকে পড়ানোর পাশাপাশি তিনি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কথা বলতেন। তার কথা শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম।

আমার সঙ্গে স্যারের বন্ধুর মতো একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তিনি আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, তোমাকে আমার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেগুলো এখনো বলার সময় হয়নি। তুমি আগে প্র্যাজুয়েশন করো, তারপর বলবো।

আমার জন্মের অনেক আগেই আমাদের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কথাগুলো শুনেছি আমার স্যারের কাছ থেকেই। স্যার একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার কাছ থেকেই শুনেছি আমাদের দেশের রাজাকারদের পিশাচপনা।

স্যার আমাকে বলতেন, শেষ বয়সটাতে তোমার কাছেই কাটাবো। তখন তোমাকে আমার না বলা কথাগুলো বলবো।

১৯৯৮ সালে এসএসসি পাস করার পর আমার বাবা ওখান থেকে বদলি হয়ে যান।

শেষ দেখার স্মৃতিটা বলতে পারবো না। কারণ তার কাছ থেকে চলে আসার জন্য বিদায় নেয়াটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। শেষ মুহূর্তে আমার মনে পড়ে, চোখের দিকে একবারও তাকাইনি, বলতে পারিনি চলে যাচ্ছি, আমার জন্য দোয়া করবেন।

ঢাকায় এসে একটি কলেজে ভর্তি হলাম। হস্টেলে ওঠার মাস খানেক পরেই স্যারের একটি চিঠি পেলাম।

আমার সে কি আনন্দ! তারপর নিয়মিত আমাদের সঙ্গে পত্রালাপ হতে লাগলো।

তিনি আমাকে লিখতেন, এখন তো ঢাকায় আছো, কিছু লেখালেখির অভ্যাস করো, দেখবে তোমার শত কষ্টের মাঝে এগুলো তোমাকে আনন্দ দেবে।

তার চিঠির অপেক্ষায় থাকতাম তীর্থের কাকের মতো।

২০০০ সালে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ি। তাই তার সঙ্গে আমার যোগাযোগটা বন্ধ হয়ে যায়।

আমার তরফ থেকে ভাটা পড়লেও স্যার আমাকে লিখতেন প্রায়ই। শেষের কয়েকটি চিঠি ছিল রাগ আর অভিমানের।

১৯৯৮ সালের ব্যাচের পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো আমার স্কুলের কয়েকজন বন্ধু। ওরা আমাকে বললো, সেই উপলক্ষে তুমি মুলাদী যেতেও পারবে আর স্যারকেও একটি সারপ্রাইজ দিতে পারবে।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হলো ২০০৪ সালের ঈদুল ফিতের দুই দিন পর। অর্থাৎ নভেম্বর মাসে। মনে মনে সব প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললাম। আর ভাবতে লাগলাম স্যারকে এমনিভাবে চমকে দেবো, যা তিনি ভাবতেই পারবেন না।

এমনি নানান ভাবনা নিয়ে আমার দিন কাটছিল।

ঈদের দুই সপ্তাহ আগে সকাল দশটার দিকে আমার এক বান্ধবী ফোন করে বললো, *খলিলস্যার আর নেই*।

এই বান্ধবী যে আমাকে খোঁচা দিয়ে বলেছিল, *এই সেই খলিলস্যার*।

মুহূর্তের মধ্যে আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। আর কয়েকদিন পরেই যাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম, সেই আমাকে সারপ্রাইজ দিয়ে চলে গেলেন। আমাকে একটিবারের জন্য তার অভিমান ভাঙানোর সুযোগ দিলেন না।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আধাকাচা চাপদাড়ি আর কিশোর ছেলের মতো অনাবিল হাসিমাখা মুখখানি। তিনিই যে আমার জীবনের প্রথম লেখার বিষয় হবেন তা কখনো ভাবতে পারিনি। কিন্তু আমার স্যার আমার লেখাটা দেখতে পারবেন না। এ যে কতো কষ্ট, কতো যন্ত্রণা, উহ!

আমি হারিয়েছি একজন বন্ধু, একজন অভিভাবক এবং আমার স্যারকে। আর দেশ হারালো একজন মুক্তিযোদ্ধাকে।

বরিশাল থেকে

প্রথম ছোয়া

আমি তখন এইসএসসি পরীক্ষার্থী। জীবন চলছিল এক হাজার মাইল গতিতে। মিউজিক করতাম, গান গাইতাম, আড্ডা মারতাম। বিভিন্নভাবে সময় কেটে যাচ্ছিল। বরাবরই মেয়েদের থেকে একটু দূরে থাকতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দূরে থাকতে পারলাম না। মীম বাধ্য করলো তার কাছে টানতে।

মীম, হ্যাঁ মীম আমার জীবনের প্রথম প্রেম। ২০০৩-এর জানুয়ারি মাসে রং নাষারে মীম আমাদের বাসায় ফোন করে। সেই রং নাষার থেকেই বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে ভালো লাগা, ভালোবাসায় রূপ নেয়।

এই প্রথম কোনো মেয়ের কাছে হার মানি। আমার গতি আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

মীম তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। মীম-এর গায়ের রং খুব ফর্শা, লম্বা পাচ ফিট তিন ইঞ্চি। খুব মেধাবী এবং খুব ধনী পরিবারের খুব ভদ্র ও খুবই সুন্দরী একটা মেয়ে।

আমাকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে মীম-এর কণ্ঠ। ফোনে ওর কণ্ঠ আমাকে ওর কাছে হার মানায়।

ফোনে পরিচয়ের প্রায় দুই মাস পর আমরা দেখা করি।

মীম আমাকে দেখার আগেই আমাকে ভালোবেসে ফেলে এবং আমিও।

প্রথম দেখার পর থেকে আমাদের টান বেড়ে গেল হাজার হাজারগুণে। সব সময় ওকে কাছে পেতে ইচ্ছে হতো। ওর পাশে বসতে, ওর হাত ধরতে ইচ্ছে হতো।

আমার মতো মীম ছিল খুব ভীতু। বাসা থেকে ও কখনো বের হতো না। শুধু স্কুলে যাওয়া আর স্কুল থেকে বাসায় ফেরা এটাই ছিল ওর কাজ। এবং ছোট মেয়ে হওয়ায় সবাই খুব চোখে চোখে রাখতো। ফলে তার সঙ্গে ঘোরার কোনো সুযোগই ছিল না।

এভাবে তার জন্মদিন এলো। সুযোগ পেলাম তাকে নিয়ে বেড়ানোর।

মীম তার বান্ধবীকে নিয়ে এক রিকশায় আর আমি অন্য রিকশায় সোজা গেলাম ওয়ান্ডারল্যান্ড-এ।

তাকে ফুল গিফট দিয়ে উইশ করি।

সে মহা খুশি।

আমরা আইসকুম খেলাম, গল্প করলাম। পরে যে যার মতো বাসায় চলে এলাম।

মীমের জন্মদিন উপলক্ষে তাকে ফোনে একটা কিস করলাম তার অনুমতি নিয়ে। তাকে একটা দিতে বললাম।

কিন্তু সে লজ্জা পেয়ে ফোন রেখে দিল।

এভাবে দিন কাটতে লাগলো। মীমকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে মীমদের এলাকায় গেলাম। তাদের বাসার সামনে যেতেই দেখি মীম তিন তলার গুলের পিছনে দাড়িয়ে।

আমাকে দেখে সে খুশিতে আত্মহারা। আমাকে ইশারা দিয়ে উপরে যেতে বললো।

কিন্তু আমি না করলাম।

সে রেগে গেল।

বাধ্য হয়ে উপরে উঠলাম দুরূ দুরূ বুকো।

ও এসে গেট খুলে দিল এবং বললো, বাসায় কেউ নেই, শুধু বুয়া আর আমি।

যখন গেলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা।

মীম বুয়াকে বললো, বুয়া দক্ষিণার বারান্দায় দুটো চেয়ার দেন।

বুয়া দুটো চেয়ার এনে দিলেন।

আমরা পাশাপাশি বসলাম। কিন্তু আমাদের দূরত্ব দুই ইঞ্চি।

বুয়া যাবার সময় বারান্দার লাইট বন্ধ করে দিলেন।

আমরা গল্প করতে লাগলাম।

বুয়া নাশতা নিয়ে এলেন।

মীমকে খাওয়াতে গেলাম।

মীম খেলো না। মীমকে বললাম, মীম, তোমার হাত দুটো ধরবো?

সে বললো, না।

এতে ভীষণ লজ্জা পেলাম। পরে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

মীম-এর ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছিলাম। ফোনে মীমকে বললাম, আমাকে এমন কষ্ট দেয়ার কারণ জানতে পারি?

মীম হেসে বললো, আমার খুব লজ্জা লাগছিল। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে হাত ধরতে তাহলে বাধা দিতাম না। কিন্তু তুমি যখন বললে তখন খুব লজ্জা পেয়েছিলাম।

ওর কথাগুলো শুনে খুব ভালো লাগছিল।

মীমকে প্রায় ফোনে কিস করতাম, কিন্তু সে কখনো করতো না। তার নাকি এসব পছন্দ না।

ফোনে তাকে আদর করতাম।

কিন্তু সে কখনোই করতো না। তার নাকি এসব ভালো লাগে না।

এসব কথা শুনে নিজেকে খুব ছোট মনে হতো।

এভাবে দিন কাটতে লাগলো। বছর পার হয়ে গেল।

প্রতিদিনের মতো মীম ফোন করলো এবং ফোন রাখার আগে বললো, আমাকে একটা কিস করো। ওর কথা শুনে সেদিন একটু অবাক হয়েছিলাম। কিস করলাম এবং ওর কাছে চাইলাম, কিন্তু ও আমাকে দিল না।

বললো, ফোনে না, সামনাসামনিই দেবো। বলে ফোন রেখে দিল।

তার কথা শুনে খুবই ভালো লাগছিল।

একদিন দুপুরে মীম ফোন করলো এবং বললো, তুমি দুপুর তিনটার মধ্যে আমাদের বাসায় আসবে। আশু বাসায় নেই, বুয়া ও আমি আছি।

না করলাম। বললাম, এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। আর আমার খুব ভয় লাগে যদি কেউ চলে আসে?

সে আমাকে অভয় দিয়ে বললো, ভয় নেই, তুমি এসো, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

বললাম, আসতে পারি এক শর্তে, আমাকে কিস করতে হবে।

ও বললো, আগে তো এসো, তারপর চিন্তা করবো।

রেডি হয়ে দুপুর তিনটার আগে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেদিন একটা ফুলহাতা ফতুয়া পরেছিলাম। তার বাসার সামনে আসতেই হার্ট বিট বেড়ে গেল।

উপরে উঠে কলিংবেল দিতেই সে দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখে তার খুশি যেন ধরে না। সেদিন মীম লাল-কালো রঙের সালায়ার কামিজ পরেছিল। সেদিন মীম ছিল অন্যদিনের চেয়ে আলাদা। সে দেখতে এমনতেই খুব সুন্দর, তারপরও সেদিন তাকে অপরূপ সুন্দর লাগছিল।

মীম সোজা আমাকে তার রুমে নিয়ে গেল। তার রুমে একটা বড় দক্ষিণা জানালা আছে। মীম খাটে উঠে জানালার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো।

খাটে বসলাম পা ঝুলিয়ে।

মীম আমাকে খাটে উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসতে বললো এবং একটা বালিশ দিল।

এই নিয়ে মীমদের বাড়ি দুই দিন এলাম। আজ মীমের সঙ্গে মিশে বসলাম।

মীম আমার কাছে আরো সরে এলো।

তার জানালার সঙ্গে বারান্দা আছে। দক্ষিণা বাতাস খুব জোরে বইতে লাগলো।

আমি হাত বাড়াতেই সে আমার হাতে হাত রাখলো। বেশ কিছুক্ষণ বসার পর সে আমার হাত টেনে নিয়ে হাতে একটা কিস করে দৌড়ে পালালো।

কিছুক্ষণ পর আমার জন্য এক বক্স আইসক্রিম ও কোল্ড ড্রংকস নিয়ে এলো। আইসক্রিম খাচ্ছি আর মীমকে খাইয়ে দিচ্ছি। বললাম, কি ব্যাপার, মাত্র একটা কিস? আর দেবে না?

সে বললো, একদিনেই সব চাও? এই বলে সে আমার খুব কাছে সরে এলো। তার চেহারা আর হাসি নেই।

সে আমার আরো কাছে আসতে লাগলো। আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আমার ঠোট স্পর্শ করলো তার ঠোট দিয়ে। তার ঠোট আমার ঠোট যেনে একাকার হয়ে গেল। সে আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল।

তাকে জড়িয়ে নিলাম আমার বুকে। তার ঠোটে, মুখে, গলায়, গলার নিচে কিস করলাম। আলতো করে কামড় দিতেই সে যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

সে নিজেকে যেন আমার হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল।

আমার হাত তার পেট থেকে বুকে বিচরণ করতে লাগলো। তার চেহারা তখন পুরো লাল হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে।

এভাবে চলতে লাগলো বহু সময়। এক পর্যায়ে বহু কষ্টে নিজের বিবেককে সামলে নিলাম। ওই সময় সব কিছুই করতে পারতাম। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে তা করতে দেয়নি। কারণ মীমকে আমি ভালোবাসি। মীমও আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।

মীমের মনে খুব কষ্ট। এতো বড় লোকের মেয়ে, তারপরেও খুবই দুঃখী মেয়ে মীম। এটা তার পারিবারিক ব্যাপার। আমি তার দুঃখের দিনের সঙ্গী ছিলাম। তার কষ্টের কথা সে আমাকে কখনো বলেনি কিন্তু তা উপলব্ধি করেছি মন দিয়ে।

সামান্য ভুলের জন্য আমিই মীমকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। এর জন্য তৃতীয় পক্ষের কেউ দায়ী।

আজ তাকে খুব মিস করছি।

তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি যেখানেই থাকো, যারই হও, তুমি আমার জীবনে প্রথম প্রেম হিসেবে থাকবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, খুলনা থেকে

ঢাল তলোয়ার

— অপু আহমেদ

একটি পুত্র সন্তানের আশায় ছয়টি মেয়ে। অতঃপর একটি ছেলে। এমন একটি পরিবারের কর্তা যদি একজনই হয় তবে বিবেচনা করুন তো অবস্থাটা কি হতে পারে? একজন স্বল্প বেতনের সরকারি চাকরিজীবীর পক্ষে তা কি যে কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারে।

জীবনে কোনো কিছুই সঞ্চয় করতে পারেননি তিনি। কিন্তু বিধাতার অসীম কুদরত যে, ছয় মেয়ের চেহারাই সুন্দর। চারজনেরই লাভ ম্যারেজ হয়েছে। বাকি দুজন।

এ পরিবারেরই সর্বকনিষ্ঠার সঙ্গে আমার প্রণয়ের সূত্রপাত ঘটে ১৯৯৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি। যেহেতু আমি যায়যায়দিনের ভুক্ত ১৯৯৫-এর মাঝামাঝি থেকে, সেহেতু প্রণয়ের দিন তারিখ তখন থেকে নির্বাচন করা। ভবিষ্যতের কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বাধামুক্ত দুটি জীবন মেতে উঠেছিল প্রেম অভিসারে। প্রতি বৃহস্পতিবার স্কুলের নামে চলে যেতাম দূরে থামে বনবাদাড়ে, সবুজ মাঠ-ঘাটে।

চলন্ত প্রেমের ছয় মাসের মাথায় এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সে বললো, আমায় বিয়ে করবে তো?

বললাম, অবিশ্বাস করছো কেন? এখন তো ছাত্র মানুষ। চাকরি না পেলে কিভাবে তোমাকে আপন করে নেবো বলো?

জানি না সে আমাকে কতোখানি বিশ্বাস করলো।

২০০০ সালের শুরুতেই সে প্রেমের চাকা ঘোরাটা বন্ধ করে দিল। তখন আমি বহুবিধ কারণে অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। সত্য কথা বলতে কি নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। ভেবেছিলাম অন্তত এই চরম দুঃসময়ে এসে সে বলবে, কেমন আছো তুমি? কিন্তু না, যা ভেবেছি হয়েছে ঠিক তার উল্টোটি।

তৎকালীন সময়ে সে আমাকে দেখলে নাক সিটকাতো। আমি যে পথে যাই সে পথ সে মাড়ায় না।

গোপনে আরো দুটি সংবাদ পেলাম। আমাদের পার্শ্ববর্তী পাড়ার এক ছেলে তাকে দুইবার বিয়ের প্রস্তাব দিলে শেষের বারে সে উত্তর দেয় এসএসসি পরীক্ষা দিই তারপর। অপরটি হচ্ছে, আরেক পাড়ার সুদর্শন ছেলের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গির আলাপচারিতা। আমার লোক তাকে দেখে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সে বৃক্ষপত্রের মধ্যে দিয়ে তার মুখ লুকায়।

প্রথম কথাটি বিশ্বাস করিনি। পরেরটিও একই অবস্থা। অত্যন্ত বিষিয়ে উঠলো মন। তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের তেমন একটি ভালো সম্পর্ক নেই।

২০০১-এর ৫ জুলাই এসএসসিতে উত্তীর্ণ হলাম। সে বছরেই ১৮ অক্টোবর আমার একটা চাকরি হয়ে গেল। লাইফ সিকিউরিটি। সরকারি চাকরি।

তারপর থেকে আমাকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। চাকরির সুবাদে তরতর করে এগিয়ে চললাম। হায়া, লাজ, শরমের মাথা খেয়ে আবার তাকেই অফার করেছিলাম।

তার উত্তর, অভিভাবক আমাকে সেখানেই যেতে বলবে সেখানেই আমার গন্তব্য, অন্য কোনোখানে নয়।

খুবই ব্যথিত হলাম। ভাবলাম একজন সরকারি চাকরিজীবী হয়েও কি তার সমশ্রেণী হতে পারলাম না? হয়তো সে তখন আরেক প্রেম অভিসারে ব্যস্ত। আমাকে দেয়ার সময় তার কোথায়?

২০০৩-এ দুই মাসের ছুটিতে গিয়ে দেখি তার মতিগতি পাল্টে গিয়েছে। সে সময় রমজানের ঈদ শেষ।

কোনো একদিন শুভ মুহূর্তে সে আমাকে এক জায়গায় ডাকলো।

গেলাম সেখানে। অনেক কথাই তো হলো। মূল কথা ছিল যে, এখন সে আমার হাত ধরে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত।

অবাক হলাম তার কথা শুনে।

সে আরো বললো যে, সে গভীর অন্ধকারে, এই অন্ধকার থেকে কে তাকে উদ্ধার করবে? কে বাড়াবে সেই হাত যেই হাত ধরে সে আলোতে উঠে আসবে? চুপ করে রইলাম।

বললো, সবাই আমাকে অন্ধকারে তলিয়ে দিল। এখন তুমি কি করবে বলো?

নীরবতা ভেঙে মনটাকে শক্ত করলাম। বললাম, তোমার সঙ্গে এই মুহূর্তে হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া তো দূরে থাকা এটা ভাবাও আমার পক্ষে অন্যায়। আজ এই মুহূর্ত থেকে যদি পাচ বছর আরো অপেক্ষা করে থাকতে পারো তবেই বিয়ে সম্ভব, না হলে নয়।

হতাশ হলো সে। অনেক কিছু বলার পরেও কিছুতেই কিছু কাজ হলো না। ভেবে বললো, আমার একটা ছেলে পছন্দ হয়েছে। আমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, তুমি কি বলো?

প্রথমে বললাম, না। পরে বললাম, শোনো, আমি পুরুষ, দীর্ঘ দিন আমি বিয়ে না করলেও কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কিন্তু তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার হাজারটা সমস্যা দাড়াবে। তাই বলবো, এই পাচ বছরের মধ্যে কোনো ভালো পাত্রের প্রস্তাব যদি আসে তবে তুমি হ্যাঁ করে দিও। আমার কথা ভুলে গিয়ে জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করো।

বললো, আমি না হয় এটা করলাম, তুমি?

আমার বিয়ের কথা বাদ দাও। ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা আরো করতে হবে। ছোট ভাইটাকে পড়াশোনা শেষ করিয়ে ভালো একটা চাকরির সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। যদি এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে করি তাহলে অ্যাসিফ-এর গান শুনবে কে? টেলিভিশনে ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ, ওয়ানডে ম্যাচ দেখবে কে? ক্রিকেট খেলবে কে? প্রতিটি ক্রিকেট খেলার আনন্দ উপভোগ করবে কে? ভরদুপুরে ছেলে, বুড়ো, বাচ্চাদের নিয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়বে কে? দুষ্টামির জন্য মায়ের বকুনি খাবে কে? বন্ধুদের সঙ্গে কলেজ, মাঠে, সিনেমা হলে আড্ডা মারবে কে? ঈদে স্পিকারে উচ্চ শব্দে গানের তালে তালে নাচবে কে? বন্ধুদের মসজিদে যাওয়ার মধ্যমণি থাকবে কে? তোমাকে কাছে না পাওয়ার বেদনাতে দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরাবে কে? বলো কে?

চুপ করো, একদম চুপ। এতোটুকু বদলাওনি তুমি! বললো সে। এতো কষ্ট বুকে নিয়ে কিভাবে তুমি বেচে থাকো? কিভাবে চলছো?

বললাম, পরে উত্তর দেবো। মনে মনে ভাবি, এটাই যদি বুঝতে তাহলে কি আমার মনটাকে চিনতে না?

এ কথা বলার পর আজ এক বছর হয়ে গেল তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। যদিও সে বোরখাওয়ালী। আপাদমস্তক ঢাকা এক মেয়ে। তার সঙ্গে কথা হয়নি। তার পুরনো কর্মকাণ্ডের জন্য সে আমার ক্ষমাপ্রার্থী।

ক্ষমা করেছি তাকে। কিন্তু তার এই পুরনো কর্মকাণ্ড আমাকে ব্যথিত করেছে। তা না হলে অনেক আগেই তাকে আমার বৌ বানাতাম। এখন আরো চার বছর অপেক্ষার পালা।

আগে যায়াদির গল্পগুলো শুধু পড়তাম, এখন দেখছি সেগুলো গল্পতে নেই। পত্রিকার পাতা থেকে উঠে এসে আঘাত হানতে শুরু করেছে তলোয়ার হিসেবে। তাই আপ্রাণ চেষ্টায় আছি ভালোবাসার ঢাল বানিয়ে তা প্রতিহত করার।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিয়ে এবং বাসর

– মনি

বিয়ে : সে ছিল লাল শ্যামলা বর্ণের পরিপূর্ণ এক নারী। তার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করতো। বাড়ির পাশে এবং তাদের বাড়িতে তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে যাতায়াত ছিল দিনে অন্তত একবার। এ আসা-যাওয়ার মাঝে কখনো সামনাসামনি হয়ে যেতাম কখনো দূর থেকে, কখনো আড়ালে দেখতাম। আর ভাবতাম তার প্রতি যে আমি দুর্বল এটা কিসের যোগ্যতায় বলবো তাকে। এ ভালো লাগার মধ্যেই সীমিত। এভাবে কেটে গেল তিন বছর। এ তিন বছরে সেও হয়তো অন্য কারো সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া করেছে। আমিও তাই করেছি।

১৯৯৭-এর দিকে তার এক চাচাকে ঠাট্টা করে বললাম, আমরা কাছে থাকতে মেয়ে কেন অন্যখানে বিয়ে দেবেন?

তিনি বললেন, তুই যদি রাজি থাকিস, আমি চেষ্টা করবো।

ঘটনা এ পর্যন্ত সীমিত রইলো। পাত্রী এবং তাদের পরিবার জানলো। মেয়ের মায়ের কথা হলো ছেলে বেকার। সুতরাং সরাসরি হ্যা, না কিছু বলে না। আবার এটাও ভাবে ছেলে আইএ পাস, ডিগ্রিতে ভর্তি। ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার না। অন্যদিকে মেয়ের বাবা প্রবাসী। দেশে হোক, বিদেশে হোক, একটা ব্যবস্থা হবেই। মেয়ের বাবা, চাচার ভাবলেন মন্দ হবে না।

বেশ কয়েক মাস এভাবে গত হলো। অবশেষে জানলেন আমার বাবা। বাবা তো খুশি, ছেলের বেকারত্ব দূর হবে বা বিদেশ যেতে পারবে। এভাবে আর কিছুদিন গেল।

১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে একটা প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরি পেলাম। এক মাস পর ঢাকা থেকে সরাসরি সিলেট। ১৯৯৮-এর প্রথম দিকে চূড়ান্তভাবে বিয়ের কথা উঠলো। আমি তো দিশাহারা। আমার এক সময়ের ভালো লাগার সঙ্গে বিয়ে। কিন্তু সমস্যা, সরাসরি হ্যা বলতে পারি না। আবার সে অন্য কারো হোক এটা ভাবতেও কষ্ট পাই।

এর মধ্যে তাদের বাড়ির এক ভাবীর মাধ্যমে জানতে পারলাম সে আমাকে পছন্দ করে। সে বিয়েতে এতোই আগ্রহ দেখালো যে, মনে হতো যেন আমাদের কয়েক বছরের সম্পর্ক।

কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। মনে ভয় ঢুকে গেল নিজের যৌন ক্ষমতা নিয়ে। ভাবতাম আমার তো স্বপ্নদোষ হয়। বৌকে তৃপ্তি দিতে পারবো কি? মনে ভয়, বৌকে তৃপ্তি দিতে পারবো না। পচিশ বছর বয়সের একটা ছেলের স্বপ্নদোষ হলে সে সঙ্গমে এবং বিয়ের জন্য উপযুক্ত হতে পারে কি, পারে না, এটার সঠিক তথ্য আমার জানা ছিল না।

এভাবে দুই তিন মাস চলে গেল।

সবাই জানলো ছেলে বিয়েতে রাজি না।

মেয়ে শুনে লজ্জিত হলো, তাদের গার্ডিয়ানরাও। তাদের জেদ আমার ওপর। অবশেষে বদনামি হলো, ছেলের রোগ আছে মানে স্বপ্নদোষে আমি ভুগি। মেয়ে সুখী হবে না।

হাজারো বদনামি এবং প্রতীক্ষা ও নিজের মানসিক ভয় নিয়ে সিলেটে পড়ে আছি। এর মধ্যে দুই পক্ষের গার্ডিয়ানরা অতিষ্ঠ হয়ে সরাসরি বিয়ের তারিখ করে ফেললেন।

না করতে পারলাম না ভয়ে।

ভালো লাগার প্রিয়ার সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো।

এবার বাসর।

বাসর : মনের ভেতর যৌন দুর্বলতা নিয়ে রাত দুইটায় তাদের বাড়িতে গেলাম। আর বেশি ক্ষণ দেরি করতে রাজি ছিলেন না দাদিরা। তাই তাড়াতাড়ি বাসর ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ দুজন একই খাটে বসে থাকার পর শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড গরম। অন্যদিকে আগের রাতে জেগে থাকা। সব মিলিয়ে শরীর ক্লান্ত।

পাচ দশ মিনিট পর আমার ভালো লাগার মানুষও পাশে শুয়ে পড়লো। ত্রিশ মিনিট পর তার কপালে হাত দিয়ে বললাম, শুয়ে পড়লে কেন?

উত্তর দিল না।

আস্তে আস্তে তার শরীরের স্পর্শ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি আর ভাবছি চূড়ান্ত কাজ তো বাকি।

কিছুক্ষণ পর তার শরীরের ওপর উঠলাম। কিন্তু তার আপত্তির কারণে বাদ দিলাম।

সকাল হলো। সকালে যখন চূড়ান্ত পর্যায় যাওয়ার জন্য তার উপরে উঠলাম তখন ব্যর্থ হলাম। শরীর ঘেমে গেল। স্ত্রীর কাছে লজ্জিত হলাম ও ভয় পেলাম।

স্ত্রী বিয়ের আগে শুনেছিল ছেলের রোগ আছে। এটা সত্য হলো মনে করে কান্না জুড়ে দিল।

ঘর ভর্তি মানুষ। কোনো মতে তার মুখ চেপে ধরলাম। সে থামলো।

রাগে, ঘৃণা মিশ্রিতভাবে তাকিয়ে বললো, তার জীবন কেন ধ্বংস করলাম?

বললাম, কোনো সমস্যা আছে বলে জানা নেই। তবে স্বপ্নদোষের জন্য ছয় মাস চিকিৎসা করালে ভালো হবো, ডাক্তার বলেছে।

স্ত্রী বললো, যতো টাকা লাগে সে দেবে চিকিৎসা করতে।

এ অসহায় মুহূর্তে শুধু এটুকু সাহসই ছিল।

তারপরও সে ভাবলো এতো কষ্ট, প্রতীক্ষার বিয়ে ব্যর্থ হবে?

সন্ধ্যার সময় স্ত্রীকে বললাম, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সে বললো, থেকে কি করবে?

দুঃখ পেলাম।

মানে আমি তো অক্ষম।

বাড়িতে গেলাম এবং রাতেই ফিরে এলাম।

এই রাতে ফাইনাল পরীক্ষা।

কিন্তু এবার পাস করলাম।

স্ত্রীর ভয় অর্ধেক কেটে গেল। আমারও তাই।

এভাবে চলতে চলতে পাকা খেলোয়াড়। প্রথম মিলনে ব্যর্থতা উত্তোল করার জন্য দিনে-রাতে ছয় সাতবারও মিলিত হতাম। উদ্দেশ্য একটাই, তাকে খুশি করা।

সে বলতো, আমি জেদ দেখিয়ে এমন করছি। এমন এক সময় এলো, সে আমার যৌন ক্ষমতা সহ্য করতে পারলো না। সেদিন তার কাছে সেক্স সক্ষম পুরুষ রূপে স্বীকৃতি পেলাম এবং গর্বিত হলাম। ভেতরে জমে থাকা পছন্দের মানুষের সঙ্গে মিলনে ভালোবাসার পরিপূর্ণতা পেলাম। স্ত্রী পছন্দের মানুষ পেয়ে ধন্য হলো।

দুজন একে অপরকে পাগলের মতো আদর করলাম।

আজ পাচ বছর প্রবাসে আছি। এ দেশে অবসর সময়ে সবাই টিভি, হিন্দি সিনেমা দেখে। আমিও তাই। কিন্তু যে সিনেমাতে বাসর রাতের দৃশ্য আসে তা দেখে আমার বুকটা ফেটে যেতে চায়। মনে পড়ে, সেদিনের অসহায় মুহূর্তগুলো, আর স্ত্রীর সেই কান্না।

পরিশেষে : পাঠক ভাইদের বলছি, বাসর রাতে স্ত্রীর কাছে আত্মবিশ্বাস নিয়ে যাবেন। এবং মনের ভয় দূর করতে চাইলে, প্রথম সঙ্গম সার্থক করতে চাইলে প্রয়োজনে *ভায়াথা* সেবন করবেন শুধু বাসর রাতের জন্য। কিন্তু সব সময় নয়।

সউদি আরব থেকে

একটি বিশেষ দিন

– এমদাদুল হক কাজল

দুপুরে অফিস থেকে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মোবাইলে রিং বাজতেই ঘুম ভেঙে গেল। ওপাশ থেকে শ্যামলীর কণ্ঠস্বর, তুমি ঠিক ঠিক পাচদিন পর বাড়ি আসবে। না এলে পাচ দিনের পরের দিনটি হবে ...। কথা শেষ না করেই কেটে দিল।

এপাশ থেকে রিং করলাম। রিং বাজছে, রিসিভ করছে না। বুঝতে বাকি রইলো না ষোড়শী বৌ আমার জন্য উদগ্রীব হয়ে গেছে। কিন্তু পাচ দিন পর কেন? নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু।

শ্যামলী আমার জীবনে নতুন। দেড় মাস হলো আমার জীবনে তার আবির্ভাব। এই প্রথম তার আবদার। যেকোনো মূল্যেই হোক, আমাকে তা রক্ষা করতে হবে। সে খুব অভিমानी, আবেগ প্রবণ। যেদিন চলে এলাম, শ্যামলী আমাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ আপ্ত কান্নায় ভেঙে পড়ছিল।

আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ও কেবলই ক্ষীণ স্বরে বলছিল, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। ওর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আমার বুকে আছড়ে পড়ছিল। আমিও বাকরুদ্ধ হয়েছিলাম। নিজের অজান্তেই তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়েছিল। ওকে শুধু শেষ সাত্বনাটুকু দিয়েছিলাম, এই তো কিছু দিন পর ওখানে বাসা পেলেই তোমাকে নিয়ে যাবো।

চলে আসার সময় একবার ফিরে চেয়েছিলাম। শ্যামলী দাড়িয়ে আছে শ্বেত পাথরের মূর্তির মতো। সকালের সূর্যের আলায়ে ওর সোনামাখা মুখখানি ঝলমল করছে। অশ্রুভেজা গাল চিকচিক করছে।

তারপর চলে এলাম যশোরে। বিয়ের পর মাত্র পাচ দিন ওর সঙ্গ পেয়েছিলাম।

চাকরি জীবনের বাধ্যবাধকতায় সব কিছু ছেড়ে চলে আসতে হলো কর্মস্থলে। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের ফাকে বার বার মনে পড়ে শ্যামলীর কথা। কিন্তু কর্তব্যের বেড়াজালে বন্দী আমি বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাই না। শেষে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। বহু চেষ্টায়, কাঠ-খড় পুড়িয়ে দশ দিনের ছুটি পেলাম।

এর মধ্যেই বাড়ি যাওয়ার দিনটা ঘনিয়ে এলো। শ্যামলীর মোবাইলে রিং করলাম।

শুধু একটি প্রশ্ন, ছুটি হয়েছে?

আমি উচ্ছ্বসিত। বললাম, আজই রাত তিনটা চারটায় তোমাকে জাগাবো।

আর কথা নয়, পথে ভালোভাবে এসো বলেই ড্রপ করলো।

রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন ধরলাম। ট্রেনটা যেন শামুক গতিতে এগিয়ে চলেছে। ট্রেনের আগে ছুটছে আমার মন। সান্ত্বাহার জাংশনে নেমে যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌছলাম তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে তিনটা। বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই দোতলায় শ্যামলীর ঘরে আলো দেখতে পেলাম। আমি নিশ্চিত, সে ঘুমায়নি।

রিকশা থেকে শ্যামলী বলতেই সে ছুটে এসে জানালায় দাড়ালো। দ্রুত নিচে নেমে লাজুক হাসিতে আমায় বরণ করলো।

সত্যিই অতুলনীয় সে। হাতে হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম।

হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই সামনে আচল পেতে দিল। এই প্রথম চোখে চোখে তাকালো।

মুগ্ধ হলাম। নির্ঘুম রাত যাপন ওর চঞ্চলা দৃষ্টিতে কোনো ছায়া ফেলতে পারেনি। মায়াভরা নিষ্পাপ মুখচ্ছবি-
তে তারুণ্য আর যৌবনের প্রাচুর্য ছড়াচ্ছে।

আমি জানি, ওর মনে অনেক কথা জমে রয়েছে। ওর কোমল মুখখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, শ্যামলী,
আমি এসেছি। তুমি খুশি হওনি?

ওর চোখে তখন নীরব কান্না স্ফটিক হয়ে ঝরছিল।

ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম। দুজনেই যেন প্রাণ্ডির পরমানন্দে ভালোবাসার গভীর আবেশে হারিয়ে
যাওয়ার উপক্রম।

এক সময় নীরবতা কাটিয়ে শ্যামলী বললো, রাত জেগে এসেছো, তুমি ক্লান্ত। আজ বিশ্রাম নাও।

আমি ক্লান্ত নই শ্যামলী, আমি সতেজ, উদ্দীপ্ত, জীবন্ত।

আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। হাই তুলতে তুলতে শ্যামলীর নিজীব কণ্ঠস্বর।

ওকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু সময় চুপসে আছি। কিছুক্ষণ পর দেখি সত্যিই সে ঘুমিয়ে গেছে।

ওকে খুব কাছে থেকে দেখলাম। সবুজ ডিম লাইটের টিমটিমে আলো শ্যামলীর স্নিগ্ধ রূপকে আরো লাভণ্যময়ী
করে তুলেছে। সন্মোহিতের মতো শ্যামলীর শরীরে হাত বুলিয়ে যাচ্ছি। সৌন্দর্যের ঘোরে পাক খেতে খেতে
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে!

ঘুম ভাঙলো সকাল দশটায়। শ্যামলীকে হাতড়িয়ে খুজে পেলাম না। চোখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পড়ে
আছি। হঠাৎ বুঝতে পারলাম কেউ হয়তো ঘরে ঢুকলো। নরম কিছুর পরশে শিহরিত হলাম।

শ্যামলী তখন আলতো জড়িয়ে ধরে আমার চোখের পাতায়, ঠোটে, গালে, কপালে চুমু খাচ্ছে।

ওর শরীরের পরিচিত মিষ্টি গন্ধটা আমাকে আবেশিত করে ফেলছিল।

ও আমার বন্ধ চোখের দুইটি বুঝতে পেরে আঙুল দিয়ে চোখ মেলে ধরলো।

দেখি দুই মেয়েটা মিটি মিটি হাসছে। চট করে তার হাত ধরে বুকে টেনে নিলাম। স্থান, কাল ভুলে অর্ধ
উন্মোচিত শ্যামলীকে আলতো ছোঁয়ায় জাগিয়ে দিলাম।

এক সময় লজ্জা পেয়ে গেল। বললো, চা-নাশতা রেডি, ওঠো, নাশতা করে নাও।

মা, ছোট বোন ও শ্যামলীকে নিয়ে একই টেবিলে নাশতা করলাম।

ঘরে গিয়ে গায়ে একটা শার্ট জড়াচ্ছি।

এমন সময় শ্যামলী একটু চমকে গিয়ে বললো, কোথায় যাচ্ছ? আজ তুমি এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও যাবে
না। আজকের দিনটা শুধু আমার। আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি। বিম্বিত হলাম, এমন দিনটির কথা কেন একবারও
মনে হলো না!

এতোক্ষণে আমার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। ঠিক ঠিক পাচ দিন পরের দিনটিই হলো ১৪ ফেব্রুয়ারি।

আর এ বিশেষ দিনটির জন্যই শ্যামলীর এতোসব আয়োজন। আমি তখন ভাবছি, এমন দিনে তাকে কি
উপহার দেবো! ব্যাগ থেকে শ্যামলীকে নীল শাড়িটা বের করে বললাম, আজকের দিনে তোমার জন্য এই
ছোট উপহার।

শ্যামলী দারুণ উচ্ছাসে তা নিল। বললো, বের হও। এখনই পরে আসছি।

আমার মনে তখনে কিশোর সূভ চপলতা। পতির সামনে নীল ভূষণা হতে লজ্জা কিসের বলে ওর চোখে
তাকালাম।

শ্যামলী লাজুক হাসলো। একটু ইতস্ততা, তারপর ছেড়ে ফেললো সকালের শাড়িটা।

ধীরে পায়ে এগিয়ে গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম পেছন থেকে।

ভালোবাসার দ্যুতি ওর দৃষ্টিতে, বললো, ভালোবাসার এই দিনে ভালোবাসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কিছু হতে পারে না। এবং সেটা এখনো পাইনি।

ওর আবেদনময়ী কথাগুলো আমার দেহ-মন রোমাঞ্চিত করে ফেললো। এতোদিন সে ছিল দ্বিধা, লজ্জা আর সংকোচের ভূষণে আচ্ছাদিত। আজকের এই দিনে সে যেন নিজেকে নতুন রূপে উপস্থাপন করলো। এ এমনটিই তো আমার কাম্য ছিল। মনে হচ্ছিল, এর আগের মিলনগুলো কেবলই বৃথা সময়ক্ষেপণ। কারণ সে ছিল নিষ্ক্রিয় জড়। মনে হচ্ছিল, সেগুলো কি মিলন ছিল, নাকি ধর্ষণ! এতোক্ষণ তার চোখে চোখ রেখেই এতো কিছু ভাবলাম।

এবার আর মন মানছে না। দুই জোড়া চোখ যেন ক্রমেই কাছাকাছি হয়ে গেছে। একে অপরের ঠোট নাগাল পেতে চাচ্ছে। জোড়া ঠোটের আবেগী চুমু থেকে শুরু। বেড়ে গেছে শরীরের রক্তস্রোত, বেড়েছে উষ্ণতা। ছোট ছোট ডালিম দুটো যেন ক্ষণিকের লাল রঙে রাঙিয়ে উঠেছে। গোলাপি বৃত্তের কেন্দ্রে এক ফোটা রক্ত বিন্দু যেন সিক্ত জিভের স্পর্শ প্রাপ্তিতে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

এতোদিনের নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে পড়ছে ওর বিপরীত সক্রিয় সঞ্চালনে। মহা মিলনের স্বর্গীয় সুখে ওর ক্ষীণ গোষ্ঠানোর ঢেউ, ওর তপ্ত নিঃশ্বাস আকারে আছড়ে পড়ছে আমার লোমশ বুক। তীব্র উল্লাসে পরস্পরের জৈবিক উদগীরণ এক সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে এলো। শেষ মুহূর্তটাতে এসে মনে হলো, আমরাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। মনে হলো, এই প্রথম আমার জীবনে কয়েকটি সুন্দর মুহূর্ত এলো। আর এ রকম কয়েকটি সুন্দর সুখময় মুহূর্তের জন্যই এ পৃথিবীতে সবার বেচে থাকা।

সবশেষে এটুকুই বলবো, দীর্ঘ বিরহ কাটিয়ে যে মিলন আসে তা সবচেয়ে মধুর হয়। আর ভালোবাসাহীন মিলনমালা অচিরেই ছিড়ে যায়। তাই সবার জীবনে মিল হোক শৈল্পিক, প্রেম হোক স্বর্গীয়। দাম্পত্য জীবন হোক মধুময়, সুন্দর। ১৪ ফেব্রুয়ারি ফিরে আসুব বার বার সবার জীবনে।

আমার প্রিয়তমা বৌ তোমাকে ধন্যবাদ।

স্বাগত তোমার এই আয়োজনে।

যশোর থেকে

নিশিডাক

— এনামুল কবির খান

বিজলী এক অনিন্দ সুন্দরী মেয়ে। সবদিক থেকে চৌকস এই মেয়ে অতি সাধারণ মানের এক ছেলের সঙ্গে ভালোবাসায় মজে গিয়ে যখন হাবুডুবু খাচ্ছে ঠিক তখন সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথমেই ওকে প্রচণ্ড রকমে ভালো লেগে গিয়েছিল।

তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, ভালোবেসে ফেলেছি বিজলীকে। তবে আমার এ ভালোবাসা মোটেই তেমনটি নয় যেমনটি বিজলী আর তার প্রেমিকের ভেতরকার ভালোবাসা। আমার ভালোবাসার স্বরূপ বোঝাতে পারবো না। খুব সহজভাবে বলতে পারি, বিজলীর জন্য আমার ভালোবাসা একটি ছেলে ও মেয়ের ভেতরকার ভালোবাসা গোছের মতো ছিল না এবং এখনো তা নেই।

বিজলীকে নিয়ে পুরনো কথায় ফিরে আসি। যখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র অর্থাৎ জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলোর শুরুতে বিজলীদের বাড়িতে আমরা ভাড়াটে হিসেবে থাকতাম। তখন সে ক্লাস টেনের ছাত্রী।

বিজলীর ভাইয়েরা পঞ্চপাণ্ডব, চারপাশের সব কিছুকে খোড়াই কেয়ার। সেই ভাইদের আদরের ছোট বোনের সঙ্গে যদি প্রেম করে কোনো অতি সাধারণ ছেলে তাহলে সেই ছেলের কপালে যা ঘটান তা-ই ঘটতে থাকলো।

রাস্তায় ফেলেই পঞ্চপাণ্ডব কর্তৃক উত্তম মাধ্যম। অ্যাডভান্স জামাই আদর আর কি! বিজলীর পরিবার থেকে নো কম্প্রোমাইজ। কোনো অবস্থাতেই ওই ছেলের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে দেয়া যাবে না। রাজকন্যার সঙ্গে দরিদ্র কৃষক প্রজার ছেলের বিয়ে অসম্ভবই শুধু নয়, এতো রীতিমতো বেয়াদবি।

অপরূপ বিজলী দিন দিন স্নান হতে থাকে। মনের কষ্ট কারো কাছে খুলে বলবে এমন কেউ বাড়িতে নেই। সবাই আপন, অথচ বিজলীর কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে।

প্রয়োজনে মানুষ যেমন বিকল্প কিছু খোজে ঠিক তেমনই হয়তো বিজলী ক্রমেই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। প্রতিদিন সময় করে একাধিকবার আমার কাছে তার আসা চাই-ই চাই। সঙ্গে মাঝে মধ্যে নিয়ে আসতো দাবার বোর্ড।

খুব চমৎকার দাবা খেলতো। কখনো দেখতাম খেলার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে যেতো ও। কখনো বা খেলা বন্ধ করে দিয়ে বিজলী আমাকে তার ভালোবাসার কথা শোনাতে। একজন মেয়ে হয়ে প্রায় অপরিচিত এক ছেলের কাছে নিজের ভালোবাসার কথা অকপটে বলে যেতো।

বিস্মিত হতাম, চমৎকৃত হতাম, উজ্জীবিত হতাম।

খুব অল্প দিনের মধ্যে টের পেলাম, বিজলীর প্রতি আসক্ত হয়ে গেছি। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ করে যেমন বিজলীকে পেয়েছিলাম তেমন করে ওকে হারাতে আমার বেশি দিন সময় লাগলো না।

আমার বাবার বদলির আদেশ হলো। বিজলীদের বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। কাকতালীয়ভাবে ঠিক ওই সময়েই বিজলীর অভিভাবকেরা বিজলীকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার জন্য ওকে অন্য শহরে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

ছটফট করতে থাকা অসহায় বিজলীর ঠেকানোর কোনো উপায় থাকলো না। যাবার সময়ে আমাকে অনুরোধ করে গেল, ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা যেন ওদের বাসা ছেড়ে চলে না যাই।

এরপর বিজলী চলে গেল। আসলে চলে যাওয়া নয়, বিজলীকে জোর করে চিটাগাং পাঠিয়ে দেয়া হলো।

বিজলীর কথা রাখা গেল না। আমরা খুব অল্প দিনের মধ্যে তাদের বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলাম। সেই চলে যাবার পর বিজলীর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ নেই। অনেক খুজেও সন্ধান পাইনি তার।

অবিশ্বাস্যভাবে বলা যায় অনেকটা সিনেমাটিক কায়দায় মোবাইল ফোনের কল্যাণে একদিন পেয়ে গেলাম বিজলীকে ত্রিশ বছর পরে।

অবাক হতে হলো আমাকে। বিজলী ঠিক সেই আগের মতোই আছে। বরং আগের চেয়েও যেন বেশি সক্রিয়, সজীব। বিস্মিত হলাম জেনে যে, সে তার প্রেমিককেই বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতে সে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিক বিজলীর দ্বারা অনেক মেয়েরাও আজ স্বাবলম্বী। বয়স বা ক্লান্তি কোনো কিছুই বিজলীকে অতিক্রম করতে পারেনি। বিজলীর সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে আমরা আবার ঘনিষ্ঠ হতে থাকি ঠিক আগের মতোই।

বিজলী আমায় ফোন করে রাত বারোটার পর।

ফোনের অপেক্ষায় থাকি। অপেক্ষায় থাকি নিশিড়াকের। ওর কাছ থেকে অনেক দূরে থাকলেও দূরত্ব বা সময় দুটোকেই আমরা হারিয়ে দিয়ে ফিরে যাই ত্রিশ বছর আগের দিনগুলোয়। পরিণত এই আমরা উভয়ে বুঝি আমরা পরস্পরকে ভিন্ন এক রূপে ভালোবাসি। এই ভালোবাসায় শরীর সম্পর্কীয় কিছু নেই। নেই ঘর বাধার কোনো স্থল।

আমরা তো যে যার ঘর-সংসার নিয়ে সুখে আছি। তারপরও আমরা প্রতিদিন দিন শেষে অপেক্ষায় থাকি নিশিডাকের যে নিশিডাক আমাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসে, যে নিশিডাক আমাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসে, যে নিশিডাকে আমরা সব কিছু ছাড়িয়ে হারিয়ে যাই অন্য কোথাও।

বাসাবাটি, বাগেরহাট থেকে

মা

– আসমা আক্তার

১৯৯৪ সালের নভেম্বর থেকেই যাযাদি নিয়মিতভাবে পড়া শুরু করি। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের পুরো পরিবারটি যাযাদির ভক্ত হয়ে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ করবো আমার মায়ের কথা। মায়ের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, দেশ-বিদেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় জানার প্রতি। যাযাদি তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দিতো। তাই তো দীর্ঘ আট বছর ধরে তিনি ছিলেন যাযাদির একনিষ্ঠ পাঠিকা।

মঙ্গলবারে যাযাদি হাতে পাওয়ার জন্য তিনি অধীর অপেক্ষায় থাকতেন।

বাবা মাঝে মাঝে বকতেন যাযাদি পেলে তিনি সংসারের সব কাজ-কর্ম ভুলে যেতেন বলে।

পত্রিকাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। লেখার সঙ্গে দ্বিমত থাকলে সেটাও প্রকাশ করতেন। সমালোচনা করতেও ছাড়তেন না। তবুও যাযাদি ছিল ওনার ভীষণ প্রিয় পত্রিকা।

১৯৯৫-তে আমার গলব্লাডার-এর স্টোন অপারেশন হয়। সেই থেকে তিনি অসুস্থ। কারণ অপারেশনের পনেরো বিশ দিন পরই বলতে শুনি, সেই জায়গায় একটি গোল বল বা চাকার মতো কিছু অনুভব করছেন।

অনেক ডাক্তার দেখালাম। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হলো। কিন্তু রিপোর্ট নর্মাল।

একজন ডাক্তার এটাকে মানসিক সমস্যা বলেও অভিহিত করলেন। অথচ দীর্ঘ আট বছর ভোগার পর গত ২০০৩ এর এপ্ৰিলে ধরা পড়লো আমার লিভার ক্যান্সার, লিভারে একটা টিউমার হয়েছিল। সেটাই দীর্ঘ অবস্থানের ফলে ক্যান্সারে রূপ নেয়।

৭ জুলাই ২০০৩-এর রাতে আমাদের চোখের সামনে আমাদের প্রিয় মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। অসহায়ের মতো তাকিয়ে ছিলাম, কিছুই করতে পারলাম না।

তাই তো এখন যাযাদি দেখলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে চশমা পরা সুন্দর হাসি-মাখা একটি মুখ। পরিচিত সেই সব ভঙ্গি। যেভাবে তিনি যাযাদি পড়তেন, এখনো যাযাদি পড়লে মনে হয় মাও বুঝি আমার সঙ্গে পড়ছেন। মনে হয় এই বুঝি বলে উঠবেন, এই লেখাটা ভালো হয়েছে কিংবা ওটা ভালো হয়নি।

তাই তো এর প্রতি মায়ের প্রচণ্ড ভালোবাসার কথা জানানোর কর্তব্য মনে করছি। জানি না ছাপা হবে কি না। যদি হয় তাহলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলবো মা, মাগো, তোমার মেয়ের লেখা তোমাকে নিয়ে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছেো মা? মা-মাগো, এমন তো কথা ছিল না। কেন এমন হয়?

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম থেকে

লেট ভ্যালেন্টাইনস ডে

– মুহম্মদ নোমান হোসেন

কবির ত্রিদিব দস্তিদারের ভালোবাসতে বাসতে ফতুর করে দেয়ার মতো না হলেও সবাই কম বেশি ভালোবাসতে পারে। এটাই জানতাম।

আমার বন্ধুরা অবশ্য ভিন্ন কথা বলে। ওরা প্রায়ই আমাকে খোটা দেয়, আমার মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা বলতে কিছু নেই, আমার মন নেই, আমি একটা রোবট শ্রেণীর লোক ইত্যাদি।

আমার ধারণা, মেয়েরা যে আমাকে বিশেষ একটা পাত্তা দেয় না, এটাকেই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে নিয়ে ওরা ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করে। আমি অবশ্য ওদের ওপর রাগ করি না। তবে মনের দুঃখে বনে যাওয়ার অবস্থা হলো।

আমার এ ব্যক্তিগত দুঃখ বোধ আর বন্ধুদের হাসাহাসির মাঝেই নয়নার প্রেমে পড়ে গেলাম। কাউকে কিছু বললাম না। এবং নিদারুণ ভয়ে আক্রান্ত হলাম।

নয়না ভীষণ সুন্দরী আর আমি একটা হাদারাম।

আকাশ কুসুম কল্লনার মতোই মেয়েটার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকলাম।

নয়নার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। কারণ প্রায়ই ওদের বাসায় যাই। কিভাবে যাই সেটা না হয় না বললাম।

আমার এ গোপন প্রেমে আমার ভয় আর অস্থিরতা দুটোই চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকলো। নয়নার সামনে যেন দাড়াতেই পারি না। কেমন ভয় লাগে, পায়ে কাপুনি টের পাই, কথা জড়িয়ে যায়, গলা শুকিয়ে আসে। শুনেছি হরমোনের এক ধরনের অবাধ প্রবাহ আমার এসব সমস্যার জন্য দায়ী। অবশ্য এসবে কান দিই না। আমার ধ্যান-জ্ঞান পুরোটাই নয়না কেন্দ্রিক।

আর মেয়েটা! কি নিশ্চিত ওর প্রতিটা মুহূর্ত। আমাকে ও গ্রাহ্যই করে না। ওর হাসি, চাহনি, চলাফেরা, বাচনভঙ্গী সব কিছুই কতো আলাদা, সবার চাইতে একেবারে ডিফারেন্ট লেডি।

আমার মুগ্ধতা যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সেটা তো জানি না। শুধু টের পেয়েছি প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। তাই চোখ বন্ধ করে অন্ধ সেজে বসে আছি। নয়নার এতো ভালোর মাঝেও দুই একটা নিশ্চয়ই অদ্ভুত আচরণ আছে। যুক্তির সে ধারা আমার কাছে একেবারেই অপ্রাপ্য। সব কিছু এ মুহূর্তে তুচ্ছও নয়, একেবারে পরিশুদ্ধ। মাঝে মাঝে ভালো লাগায় এতোটাই আপ্ত হই যে, অত্যাশ্চর্যে ভজঘট পাকিয়ে ফেলি।

হ্যাঁ, ওর একটা ব্যাপার একটু অসহ্য লাগে, মেয়েটা আমাকে একেবারেই পছন্দ করে না। আমাকে দেখলেই ও দশ হাত নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে।

একবার ওদের বাসায় গিয়ে দেখি, ও কি একটা কাজে খুব ব্যস্ত। বসে কি যেন করছে। একটু উকিঝুকি মারলাম।

ছবি আকছে। সেদিন নাকি ওর ছবি আকা দিবস। কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে এ ব্যাপারে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে।

একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। এ ঘোষণাটা শুধু আমাকে দেখেই জারি হয়েছে, এ ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত। আগে আকা ওর কিছু ছবি একবার দেখে ফেলেছি, এ জন্য এ সতর্ক অবস্থা। ঢঙ! আমি ছবি দেখে থাকলে এমন কি সমস্যা? যত্নোসব!

নয়না অবশ্য খুব ভালো ছবি আকতে পারে। ওর হাতের ছবি যেন ঝলমল করে। কিভাবে যেন ছবিতে ও প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। ছবিগুলো যেন কথা বলে ওঠে।

ওর ব্যাপারে আরো মুগ্ধ আর আরো দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি। আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে অদ্ভুত এক শিহরণ বয়ে যায়।

ছবিগুলো কেন জানি অন্য রকম ভালো লেগে যায়। কোনো বিশ্বয় বোধ ছাড়াই ছবিগুলো চমৎকার। এ ব্যাপারে এমনিতেই মুগ্ধ। নয়নার ছবি বলে কথা! ওর সব কাজেই অপরিমিতভাবে আনন্দিত হই। সব কিছুই

এতো হৃদয়তার সঙ্গে নিই যে, আমার মাঝে যে কোনো বিরক্তি, রাগ, ক্ষোভ আছে, মাঝে মধ্যেই তা ভুলে যাই।

নিষেধাজ্ঞা দিবসে আইন অমান্য করলাম। তাই ও রাগ করে ছবি আঁকা বন্ধ করে দিল।

একটু অপ্রস্তুত হলাম। তবে দমে গেলাম না। এতো সহজে আমি হাল ছেড়ে দিতে পারি না। ফাইলে আটকে থাকা অনেকগুলো ছবির মধ্যে একটা আমার খুব মনে ধরলো। সম্মতির তোয়াক্কা না করেই সেটা ক্লিপচ্যুত হলো।

মেয়েটা অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে। সে হ্যাঁ, না কিছুই বললো না।

শুধু বললাম, ছবিটা পরে দিয়ে যাবো।

এই আপোসহীন গ্রহণ আমার জন্য সুখকর হলো না।

এভাবে আপোসহীন ডাকাতি ওর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল। ও খুব সহজেই ভয় পেয়ে যায়।

ভয় তো আমিও পাই। ওর তুলনায় আমি তো আসলে আতঙ্কে দিন কাটাই। তবুও আমার উদ্দেশ্যহীন ছবি ডাকাতির নিকটবর্তী ও পরবর্তী ঘটনার ওপর এর প্রভাব হলো ভয়াবহ।

ছবি ডাকাতির কিছুদিন পরের কথা। সে বছর ঠিক হলো নয়নারা ঈদে আমাদের বাড়িতে আসবে। আর ওরা ঠিক এসেও পড়লো।

আমি তো মহাখুশি। আমার প্রতি ধমনিত, শিরায় শিরায় সহস্র তন্ত্রীতে ভিন্মাত্রার এক সুর বেজে উঠলো।

আমার এ উপাত্ত মনে হয় সবাই একটু টের পেয়েছে কেবল নয়না ছাড়া। মেয়েটা আমার সমস্ত ব্যাপারে শতভাগ উদাসীন। তবু ওর নিষ্পৃহ মনোভাবে ভড়কে গেলাম না। নয়নার কাছে দেখলাম একটা আংটি এবং সবাই সেটা নিয়ে গুঞ্জন তুলছে।

তাই উৎসাহী হলাম। একটা বহুরূপী আংটি। রঙ পাল্টায়। ভিন্মজনে ভিন্ম ভিন্ম রঙ ধারণ করে।

অভিভূত হলাম। কিছুটা কৌতুক বোধ করলাম। তারপর উৎসাহের সীমা পার হয়ে যা করার তাই করলাম। আংটিটা নিয়ে আসলাম।

চমৎকার আংটি। যত্ন করে রেখে দিলাম।

আংটিটা আসলে এমনিতেই এনেছি। ওকে একটু রাগানোর জন্য এনেছি। নিষ্পৃহ একজন মানুষকে সক্রিয় করার জন্য একটু বাড়াবাড়ি করেছি। ঠিক করে রেখেছিলাম, নয়না চাইলেই ওকে আংটিটা ফেরত দেবো।

ভুল হয়ে গেছে। পরদিন ছিল ঈদের দিন।

ও ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দিল। সবাইকে নিয়ে ঘোট পাকালো।

ঈদের দিন দুপুরে সবাই মিলে আংটি উদ্ধার অভিযানে এলো। সবাই যে কিভাবে এই একটা তুচ্ছ ঘটনায় ওর পক্ষে চলে গেল! কেউ কেউ এসে রীতিমতো তল্লাশি শুরু করলো।

এ ব্যাপারে আমার সংকোচের সীমা রইলো না। খুব বিব্রত হয়েছি।

আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রথমে আমার নিজের ওপর এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম নয়নার প্রতি আমার রাগ রাগ একটা অনুভূতি কাজ করছে। আংটি তো চাইলেই ওকে দিয়ে দিতাম!

সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গেলাম। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে পুরো রাগটা ওদের ওপর ঝাড়লাম।

ওরা তো একেবারে থ। দুই একজন আমার মাথায় পানি ঢালার পরামর্শ দিল।

লাভ হলো না তেমন একটা। রাতে হুড়মুড় করে বাড়িতে লাগলো রাগ আর খারাপ লাগা একটা অনুভূতি।

সারা রাত নিরুদ্ম কাটালাম। এ রকমই হয় আমার। নয়নার সঙ্গে আমার নির্বুদ্ধিতার প্রতিটি ঘটনাতেই নিরুদ্ম কাটিয়েছি। প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, এর চেয়ে মরে যাওয়া আর কতোটুকুই বা কষ্টের! কতোবার যে এভাবে মরেছি...।

নয়নার সঙ্গে দেখা করি না রাগে আর অভিমানে। আমার মতো ভিখারি প্রেমিকের অভিমান তো ওর কাছে একেবারেই নসি। কাজেই একতরফা এই অসম ভালোবাসার খেসারত স্বরূপ সব কিছু ভুলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলাম। ভাললাম এ বসন্তের দিনে কি করা যায়?

প্রতিবারেই যেভাবেই হোক, ভালোবাসার মিষ্টি দিনটিতে আমার ভালোবাসার, আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি কেমন আছে, কতোটুকু ভালো আছে? শুধু এটুকু জানতে আমি যেখানেই থাকি না কেন, সব বাধা-বিপত্তি অত্যাচার করে আমি ঠিক ঠিক নয়নার কাছে ছুটে যাই।

নয়না অবশ্য আমার এ ভাবনার কিছুই জানে না। সে হয়তো বা শুধু এটুকু অনুভব করতে পারে, একটা ব্যক্তিত্বহীন, হাদারাম লোক ওকে বিরতিহীনভাবে ভালোবাসে যেটুকুর প্রত্যুত্তর না দিলেও ওর কিছু যায় এসে না। তাই মাঝে মাঝে আমার স্পিরিটে একটু ঘাটতি দেখি, একটু হতাশার ছায়া এসে জুড়ে বসে সেখানে। তবু ভালোবাসার দিন বলে কথা!

গেলবারে ঠিক করলাম একটু অন্যভাবে ওর সঙ্গে দেখা করবো। বাসায় যাবো না।

নয়না প্রতিদিন সকালে স্কুলে যায়। ঠিক করলাম, সেই সময়টাতে দেখা করে ওকে একটু চমকে দেবো।

আবারও আমার ভুল হয়ে গেল। জানতাম না এ দেশের মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে রাজনীতিবিদদের যোজন যোজন তফাত। আমি জানতাম না, হরতাল নামের একটা মরসুমি মুসিবত আমাদের ওপর যখন-তখন নাজিল হতে পারে। পুরো দিনটার ব্যাপারে আমার এতোদিনের ভাবনায় কেউ যেন বরফ শীতল জল ঢেলে দিল। গভীর বিষাদে, অনির্বচনীয় হতাশায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।

এরপর কোনো উপায় না পেয়ে নতুন একটা পরিকল্পনা করলাম।

প্রয়োজন যেমন আইনের জন্ম দেয় তেমনি ভালোবাসার স্বার্থেই ১৫ তারিখে লেট ভ্যালেন্টাইনস ডে হিসেবে চাপিয়ে দিলাম। ভালোবাসতে জানলে দিবস কোনো ব্যাপারই না! হরতাল তো একেবারেই তুচ্ছ। শুধু নয়নার এতোটুকু সম্মতি হলেই হয়!

ভালোবাসা দিবস পুরোটাই কাটালাম একটা আশংকা নিয়ে। বারে বারেই একটা অমূলক চিন্তা ঘুরে-ফিরে এসেছে, পরদিন সকালে ও আসবে তো?

আমার আশংকা মিথ্যে প্রমাণ করে নয়না ঠিকই এলো। দেখলাম, ও বীরদর্পে হনহন করে স্কুলে যাচ্ছে।

ওকে ডাক দিলাম। না শোনার ভান করেও পরে তাকালো।

হঠাৎ আমার হার্ট বিট এতো বেড়ে গেল যে, নিজেই ধুকধুকানি বুঝতে পারলাম।

এরপর আমার নতজানু হবার পালা। বললাম, প্লিজ, একটু সামনে চলো। সামনে মানে ফুলের দোকানে, কিছু ফুল কিনবো।

নয়না পাথর হয়ে যাচ্ছে। সে প্রতিবাদ করে বললো, স্কুলে দেরি হয়ে যাবে, এখন যাওয়া যাবে না।

শেষে অনুরোধে ঢেকি গেলার মতো করে রাজি হলো।

কিছু গোলাপ কিনে ওকে দিয়ে বললাম, ভালোবাসা দিনের বিলম্বিত শুভেচ্ছা।

বিনিময়ে পেলাম শুকনো একটুকরো হাসি আর তারচেয়ে সংক্ষিপ্ত শব্দ *ধন্যবাদ*।

নয়নাকে স্কুল পর্যন্ত পৌছে দিলাম।

সে অবশ্য বার বার আমাকে যেতে নিষেধ করেছিল।

স্কুলের গলিটা পার হয়ে মোড়টায় এসে মনে মনে আমি একটু ভেবে খুশি হলাম যে, ভালোয় ভালোয় শুভেচ্ছাটুকু তো জানানো গেল! এবারে আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরানো যাক।

সিগারেট ধরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ঠিক সে মুহূর্তে আমার পাশে এসে একটা ছায়ামূর্তি দাড়িয়েছে।

থাহ্য করলাম না।

আমার বিশ্বয়ের ঘোর কেটে যাওয়ার আগেই নয়না বলে উঠলো, তুমি এ সিগারেটটা খাবে না।

একটু ভাব নিয়ে বললাম, তোমার শরীর খারাপ করেছে নাকি?

নয়নার চোখে অপার্থিব দীপ্তি। আগে কখনো এমন ঝিলিক দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একটু হেসে, একটু টেনে টেনে সে বললো, আমার শরীর মোটেই খারাপ করেনি, তবুও আমি আজ ক্লাস করবো না এবং এ মুহূর্তে বাসায়ও যাবো না।

ভালো সমস্যায় পড়া গেল! এতোটা আশা করিনি। ধাতস্থ হতে আমার কিছু সময় লাগলো।

এরই মধ্যে দেখলাম এক ঝাপটা দখিনা বাতাস নয়নার কপালের উপরের চুলগুলোকে নিয়ে এক অপাপবিদ্ধ স্বর্গীয় খেলায় মেতে উঠেছে।

আর আমার সুন্দরী নয়না যেন এক অঙ্গুরী হয়ে উঠেছে।

গভীর আনন্দে সমস্যার কারাগারে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বৃদ্ধ হয়ে রইলাম।

আলগী পাচগাও, চাদপুর থেকে

ঘৃণা করার কষ্ট

– সোমা

সুখেই কাটছিল আমার কলেজের দিনগুলো। ফ্রেন্ডদের সঙ্গে আড্ডা মারা, গল্প করা ও সীমিত গঞ্জির মধ্যে ঘুরে বেড়ানোই ছিল পড়াশোনা ছাড়া প্রধান কাজ।

আমার এক বান্ধবীর মাধ্যমে হঠাৎ করে পরিচয় হলো জীবন (ছদ্মনাম) নামের একটা ছেলের সঙ্গে। সে নামকরা এক বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ পড়ছে। প্রথমে জীবনই আমার ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করলে তেমন পাত্তা দিইনি।

পরবর্তীকালে আমার বান্ধবীদের অধিক উৎসাহে ও কৌশলে জীবনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার ব্যক্তিত্ব ও মার্জিত আচরণ এবং সুন্দর করে কথা বলা আমাকে বেশ খানিকটা প্রভাবিত করলো।

বাসায় আসার পর কেমন যেন অন্য রকম একটা অনুভূতি কাজ করতে লাগলো। এটা আগে কখনো কাজ করেনি। অন্য দর্শনটা মেয়ের চেয়ে নিজেকে একটু আলাদা রাখতে চেয়েছি।

আমার বান্ধবীদের মধ্যে যখন প্রায় সবাই চুটিয়ে প্রেম করা ও মন কষাকষি নিয়ে ব্যস্ত তখন ওদের নিয়ে হাসতাম এবং মনে মনে গালি-গালাজ করতাম। যেই আমি কখনোই কোনো ছেলের কাছে ধরা দিইনি সেই আমাকে জীবন কতো সহজে যেন আয়ত্ত করে ফেললো! ফোনে কথা ও মাঝে মাঝে দেখা হতো আমাদের।

এভাবেই কাটলো তিনটা মাস। এ তিনটা মাসেই আস্তে আস্তে জীবন আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে গেল। আমার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণায় তখন শুধুই জীবন। প্রতিটি দিন শুরু আর শেষ হতো তখন জীবনের কথা মনে করে।

যে জীবন অন্য দশজনের চেয়ে ছিল আলাদা ও সুন্দর মনের মানুষ সেই জীবন হঠাৎ করে বদলাতে শুরু করলো। দেখা করার কথা বলে আসে না, ফোন করলে নানান অজুহাত দেখায়। প্রথম ভাবলাম হয়তো সত্যিই ব্যস্ত, আমি অযথা কষ্ট পাচ্ছি। শেষে ফোন করলে লাইনটা কেটে দিতে লাগলো।

প্রথম যেদিন বুঝলাম যে, জীবন নিজ ইচ্ছায় লাইনটা কাটছে, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। যে জীবন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এক ঘণ্টা আগে এসে বসে থাকতো সেই জীবনের এতো পরিবর্তন! এতো পরে বুঝলাম তার পরিবর্তন যখন আমার নিজস্ব সত্তার আত্মসম্মান বোধটুকুও রইলো না। চারদিক থেকে অন্ধকার নামলে মানুষ নিজের ছায়াটাকে যেমন হারিয়ে ফেলে তেমনি আমাকে হারিয়ে ফেললাম জীবনের শূন্যতায় ও তার দেয়া কষ্টে।

আমার ভালোবাসায় তো কোনো খাদ ছিল না। আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে তো তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। তবে কেন তুমি এমন করলে? আর কেনোই বা আমার সুখের জীবনে এসে সব কিছু ওলট-পালট করে চলে গেলে? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি! শেষে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমার মতো এমন প্রতারক ও কুৎসিত মনের মানুষের জন্য আর কাদবো না। কিন্তু এই লেখা লেখার সময় আমাকে আবারও কাদতে হলো।

ঘৃণা করি ওই লোকটাকে আজ, প্রচণ্ড পরিমাণ ঘৃণা করি। কিন্তু মাঝে মধ্যে মনে হয় ঠিক যতোটা হারে ঘৃণা করতে চাই ততোটা পারি না। ভালোবাসার মানুষকে ঘৃণা করার মতো কষ্ট বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। জীবনের দেয়া ভালোবাসার কষ্টগুলো আজও আমাকে গ্রাস করে চলেছে।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ভেজাইল্যা

– জে এম কে জাহিদ

ফুটবল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। অনেক দিন হচ্ছে বল খেলতে পারছি না পরীক্ষার কারণে। এখন পরীক্ষা শেষ। প্রতিদিন বল খেলতে যাই। আমাদের বাড়ির পাশে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। তার নাম আলম। সে আমার তিন বছরের জুনিয়র।

আমরা এমন বন্ধু একজনকে না দেখলে অন্যজন থাকতে পারি না। দুজনে একই সঙ্গে বল খেলতে যাই। আমি গিয়ে তাকে সংগে নিয়ে মাঠে যাই।

আলমের পরিবারের সবাই আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

আমি পরিবারে সবার ছোট। তাই কেউ আমাকে কোনো কাজে বাধা দেয় না।

আলমের বাড়িতে যেতে যেতে আমি যেন তাদের একজন হয়ে গেছি। আলমের একটি বোন আছে। আলমের খোজে গেলে মাঝে মধ্যে সে আলমকে ডেনে দেয়।

একদিন আলমকে ডাকতে গিয়ে তাকে পেলাম না। তার মা বলছেন, আলম একটু কাজে গেছে। এখনি চলে আসবে। তুমি বসো। এই রনি এদিকে আয়।

আলমের বোনের নাম বি রনি আক্তার। সবাই রনি নামে ডাকে।

রনিকে তার মা বললেন, তুই কোন অংকটা বুঝতে পারছিস না? সেটা তোর ভাইয়ার কাছ থেকে জেনে নে।

রনি আমাকে ভাইয়া বলে ডাকে। রনি বললো, ভাইয়া ভেতরে আসুন।

আমি পড়ার টেবিলে গিয়ে বসতেই সে বই-খাতা নিয়ে চলে এলো।

রনি এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালো। ক্লাস টেনে পড়লেও এখনো ওড়না ব্যবহার করে না। আমার সামনের একটা চেয়ার টেনে বসলো।

তার দিকে তাকাতেই প্রথমে আমার চোখে পড়লো তার বাড়ন্ত সামনের ওই জিনিস দুটির ওপর।

রনিকে অনেকক্ষণ পড়িয়েছি। এরই মধ্যে আলম চলে এলো। আমি রনিকে পড়াচ্ছি দেখে আলম বললো, বন্ধু, তুই পারবি না ওকে পড়াতে। ওকে পড়াতে হলে ওর মতো একটা গাধি লাগবে। অবশ্য তুই চেষ্টা করলে ওকে মানুষ করতে পারিস। কমপক্ষে এসএসসিটা পাস করতে পারবে।

আলম আর আমি বল খেলতে চলে গেলাম।

রনির মা একদিন আমাকে বললেন, তোমার তো এখন তেমন কোনো কাজ নেই। খেলতে যাওয়ার আগে রনিকে এক টাইম পড়াতে পারলে খুব ভালো হয়।

বললাম, ঠিক আছে। তখন থেকে রনিকে পড়াই।

পড়া শেষ হলে রনি প্রতিদিন আমার জন্য চা নিয়ে আসে।

আগে চা একটু কম খেতাম। এখন খেতে খেতে চা খাওয়া নেশা হয়ে গেছে।

ইদানীং রনি আমাকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলে। আমি তাড়াতাড়ি গেলেও সে কথা বলে বলে বসে থাকে। পড়া শুরু করতে করতে আগের টাইম হয়ে যায়। সে মাঝে মধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন সে পড়তে বসলো। এমন একটা ড্রেস পরেছে, তার স্তন দুটি যেন কাপড় ভেদ করে বেরিয়ে আসবে। অনেক খেয়াল করেছে। রনির শরীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে তার গোলাপ ফোটা ওই ঠোট দুটি।

রনি আজকে আমার পাশে বসে একটা অংক বুঝে নিচ্ছে। রনি আমার গা ঘেষে বসে আছে। মাঝে মধ্যে সে আমার হাত ধরে। রনি কি যেন আমাকে বলতে চায়। তবে বলে না। রনি আমাকে বললো, আপনাকে একটা জিনিস দেবো কাউকে দেখাবেন না।

বললাম, না দেখার জিনিস হলে দেখাবো না।

রনি বললো, যাবার সময় দেবো।

সেদিন চলে আসার সময় রনি আমার হাতে একটা ভাজ করা কাগজ দিল।

রাতে কাগজটা পড়ে বুঝতে পারলাম সে আমাকে মন-প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসে।

সে জানে না আমি তাকে কতো ভালোবাসি। তাকে পড়ার আগে মনে মনে টার্গেট করেছিলাম তাকে ভালোবাসবোই। কারণ রনির বড় বোনের সঙ্গে আমার চ্যালেঞ্জ ছিল। রনির বড় বোনকেও ভালোবাসতাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এখন নির্দিষ্ট টার্গেটে পৌছাতে সক্ষম হয়েছি।

রনি আমাকে আমার মতামত জানাতে বলেছে।

কাগজে লিখে জানাবো না। তাতে অনেক ঝামেলা আছে।

পরদিন পড়া শুরুর করার আগে রনি আমাকে বললো, আজকে কি দেয়ার কথা?

বললাম দিতে হবে না, মুখে বলছি। তোমাকে অনেক আগে থেকে ভালোবাসি। তোমাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

আমার কথা শুনে রনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তার ফর্শা গোলাপ ফোটা মুখখানি অপরূপ হয়ে গেল।

এখন আমরা দুজন দুজন।

একদিন রনিকে পড়াতে বসেছি। হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল।

বললাম, আজকে রাতে পড়াতে পারবো না। এখন আমার একটু কাজ আছে।

আলমকে বললাম, আলম, আজ আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। হয়তো রাতে নাও আসতে পারি। এই বলে চলে এলাম।

আমার বান্ধবীর বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে রাতে আর বাড়িতে আসতে পারিনি। সারা রাত বিয়ের অনুষ্ঠানে কাটিয়েছি।

পরদিন পড়াতে গিয়ে আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

রনি বলছে, কালকে আসেননি কেন? আমি আপনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিলাম।

বললাম, অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। তোমাকে না দেখলে আমি ঘুমাতে পারি না। জানেন, কালকে বাড়িতে অনেক অতিথি এসেছিল। আপনি থাকলে খুব মজা হতো। রনি বলছে, আমি একটু আসি। এই বলে সে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এলো হাতে আপেল এবং অন্যান্য নাশতা নিয়ে।

বললাম, আমার ওই আপেল খেতে মন চাইছে না।

রনি বললো, কেন এগুলো একেবারে তাজা।

বললাম এর চেয়ে তাজা আপেল খেতে চাই।

সে বললো, আমি কি আপেল গাছ রোপণ বুনেছি, আপনাকে এর চেয়ে তাজা আপেল এনে দেবো?

বললাম, রনি, তোমার ওই আপেল দুটো চাই। বলো, দেবে?

রনি বললো, এগুলোতো আমি একমাত্র আপনার জন্য রেখেছি। আপনার যখন ইচ্ছে হয় খাবেন।

তখন তার ওই কৃত্রিম আপেল দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় খোসা ফেলে দিয়ে অর্থাৎ কাপড় তুলে কয়েকটা চুমু খেললাম।

হঠাৎ বাইরে কারো আওয়াজ শুনে দুজনে আলাদা হয়ে গেলাম।

বললাম, সত্যিই তোমার ওই দুটি দারুণ সুন্দর। বাকি জিনিসগুলো কতো সুন্দর আল্লাহই জানে।

রনি বললো, সময় হলে সব দেখতে পারবে।

বললাম, রনি, তুমি আমাকে কোনোদিন ভুলবে না তো?

রনি বললো, আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকলে সে রক্তও তোমার কথা বলবে। আমি শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার আগ পর্যন্ত যেমন বাধা আসবে আসুক, আপনার নাম ভুলবো না। আগামী মাসে আমার ফাইনাল পরীক্ষা। আমার এখনো সব বিষয়ে প্রস্তুতি হয়নি। তাছাড়া আগামী মাসে আমার মামার বিয়ে। এখন কি করবো বুঝতে পারছি না।

রনিকে পরীক্ষার জন্য ভালো করে পরামর্শ দিলাম।

এভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

রনির মা একদিন আমাকে বললেন, কালকে আমার ভাইয়ের বিয়েতে যাচ্ছি। সঙ্গে আলমকে নিয়ে যাবো। ভাবছিলাম তোমাকেও নিয়ে যাবো। কিন্তু এখন রনির পরীক্ষা। তাই তোমাকে নিতে পারছি না। আবার সবাই চলে গেলে রনি একা থাকতেও পারবে না। তাই তুমি যদি কালকে রাতটা আমাদের বাড়িতে একটু থাকো তাহলে খুব খুশি হবো। প্রয়োজনে তোমার আন্মাকে বলে আসবো।

বললাম, ঠিক আছে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

রনি মাকে বললো, মা, আমার ভয় লাগবে, তোমরা কালকে অবশ্যই চলে আসবে।

ঠিক আছে মা।

এরপর সবাই বিয়ে বাড়িতে চলে গেল। বাড়িতে শুধু আমি, রনি, আর একজন কাজের লোক।

রাতে রনিকে বললাম, আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। কাছে এসো না, তোমাকে একটু আদর করি।

রনি বললো, আজকে যদি আদর না করো তাহলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই বলে রনি কাছে এসে আমাকে একটা চুমু দিয়ে চলে গেল। আমি ধরে ফেলার আগেই চলে গেল। বললো, আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও।

সেদিন রাতে খুশিতে আমার পেট ভরে গিয়েছিল। তাই কিছুই খেতে পারলাম না। খাওয়ার সময় শুধু তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

রনি বললো, রাতভর ধরতে পারবে। এখন ছাড়া।

খাওয়া শেষে দুজনে বেডরুমে গিয়ে রনিকে প্রথমে তার আকর্ষণীয় ঠোট দুটিতে চুমু দিলাম। এরপর তার গালে, পিঠে এবং বুকে। এক সময় দুজনই উত্তপ্ত হয়ে গেলাম। তাকে জড়িয়ে ধরে আছি। রনিকে কাপড় খুলে এক রকম মূর্তির আকারে তৈরি করলাম। রনির বিশাল সাইজের কচি স্তন দুটিকে মুখে নিয়ে অনেকক্ষণ আদর করেছি।

রনি আমাকে বলছে, আমি তো আর থাকতে পারছি না।

এক সময় আমি আরো গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করলে রনি বললো, আমার ভয় লাগে।

বললাম, তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু রনি আমাকে নাগিনীর মতো প্যাচিয়ে ধরে আছে। এরপর আস্তে করে তাকে খাটের ওপর তুলে সুন্দর করে মনের কাজটা সেরে নিলাম।

রনি বললো, আমার জীবনে অনেকে আমাকে প্রেমের অফার দিয়েছিল। কেউ আমার ধারেকাছে আসতে পারেনি। আজ তোমার সঙ্গে এই ভেজাইল্যা কামটা করলাম। তোমার সঙ্গে এই ভেজাইল্যা কাজটা করে আমার জীবন কানায় কানায় ভরে গেল। সুযোগ বুঝে আমাকে এভাবে আনন্দ দেবে।

বললাম, এইটা কতো ভালো কাজ। তুমি ভেজাইল্যা বলছো কেন?

রনি বললো, ভালো না ছাই।

এখন রনির সঙ্গে দেখা করতে গেলে আগে, বলি ভেজাইল্যা, না আসল।

কল্পবাজার থেকে

চাকরিজীবী নারী

– রাহীমা

অনেক দিন পর রীনার সঙ্গে একটা ব্যাংকে দেখা। সে একটা এনজিও-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা। খুব ভালো বেতনের চাকরি। তার হাজব্যাণ্ড একজন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। দুই ছেলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। শুনে বেশ ভালো লাগলো।

আমার ছোটবেলার সঙ্গী রীনা। একই পাড়ায়, একই স্কুলে, একই ক্লাসে এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। তারপর দুজন দুই ইউনিভার্সিটিতে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও খুব কম দেখা হতো। প্রায় দশ বারো বছর পরে আবার দেখা। তাকে দেখে খুব আনন্দ লাগলো।

গত কয়েক বছর অফিস আর সংসার নিয়ে এতো বেশি ব্যস্ত ছিলাম, কারো সঙ্গে বাধ্য না হলে যোগাযোগ করতাম না। অনেকটা স্বার্থপরের মতো। অথচ আমি আর রীনা এক সময় একজনকে ছেড়ে আরেকজন থাকতে পারতাম না। প্রতিবেশীরা আমাদেরকে জোড়মানিক বলতো। বহুদিন পর দুজন দুজনকে দেখে জড়িয়ে ধরলাম।

আশপাশের সবাই আমাদের দিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর থেকে ফোনে প্রায়ই আমাদের কথা হয়।

রীনা একদিন আমাকে বললো, আমাকে একটু সময় দে, আমার একটা সমস্যা আছে। তোর সঙ্গে বলে তার সমাধানের চেষ্টা করবো।

একদিন সুযোগ করে দুই বাস্কবী একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে বসলাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে রীনা যা বললো তা হুবহু তুলে ধরছি।

আমি আমার বস প্রায় সাত বছর ধরে এক সঙ্গে কাজ করছি। তিনি খুব ভালো লোক। ভালো ফ্যামিলির সন্তান। আমি আর বস বড় একটা এসিসহ রুমে বসি। অফিসের কাজের জন্য প্রায়ই তার সঙ্গে ফিল্ড ভিজিট করতে যাই। এক সঙ্গে অনেক কাজ করি। আলোচনা করি। অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত খুব কমই তার সঙ্গে কথা হতো। আমার অনেক কাজে তিনি বেশ সাহায্য করেন।

হঠাৎ কয়েকদিন ধরে খেয়াল করলাম, তিনি রুমে খুব একটা বসেন না। আমাকে এড়িয়ে চলেন। আমাকে দেখলে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

আমার খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো। ভাবলাম আমি কি কোনো ভুলক্রমে অন্যায় কিছু করেছি? মনে করতে পারলাম না। আমারও জেদ চাপলো। আমিও তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম। যেহেতু তিনি আমার বস, প্রয়োজনে কথা বলতেই হয়।

তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই উত্তর দেন।

আমিও তার দিকে তাকিয়ে কথা বলি না। কিন্তু মনে খুব কষ্ট পেতে থাকলাম। আমার কিছু অন্যায় হলে তিনি বললেই শুধরাতে পারি। সেই সুযোগও তিনি দিচ্ছেন না। অস্থির ভাব নিয়ে অফিস করতাম। সব কিছু বিরজিকর মনে হতে লাগলো।

একদিন সাহস করে বসকে বললাম, স্যার, আমার সিট অন্য রুমে সেট করা যায় না?

সঙ্গে সঙ্গে বিরজিভরা চেহারা নিয়ে উত্তর দিলেন, কেন? এখানে আপনার অসুবিধা? আমি কি আপনাকে ডিসটার্ব করি?

বিনীতভাবে বললাম, আমার মনে হচ্ছে আমি এ রুমে থাকাতে আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে।

তিনি বললেন, কোনো রকম ভনিতা না করে বলি, এ রুম থেকে আপনি কখনো যাবেন না, আপনি এখান থেকে চলে গেলে আমি থাকবো কি করে? আমি যে আপনাকে ছাড়া এখানে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারি না। আপনি কি কিছুই বোঝেন না?

আমি সব শুনে থ হয়ে গেলাম।

তারপর থেকে যে কি হলো বুঝতে পারছি না। মনে হলো, সত্যিই তো বসকে ছাড়াও আমার তো কাজ করতে ভালো লাগতো না। ইদানীং তাকে না দেখলে ভালো লাগে না। কাজে মন দিতে পারি না। বস থাকলে সব কাজ সুন্দরভাবে করতে পারি। কোনো কাজ পড়ে থাকে না।

বস সব সময় ভালোভালো কথা বলেন। অফিশিয়াল কাজে সুন্দর পরামর্শ দেন। মাঝে মাঝে নিজের দুর্বলতার কথা শোনান। আমার প্রতি প্রথম থেকে নাকি দুর্বল। আমাকে সেটা বোঝানোর জন্য গত পাচ বছর অনেক চেষ্টা করেছেন। অনেক কৌশল অবলম্বন করেছেন। আমি বুঝতে পারিনি বলেই আমাকে সরাসরি তার দুর্বলতার কথা নাকি বলেছেন। আমাকে শোনালেন, আমাকে ছাড়া তার জীবন অর্থহীন। যখন যে অবস্থায়ই থাকেন, আমাকে নিয়ে ভাবেন। আমাকে আরো জানালেন, আমাকে কোনো না কোনোদিন সম্পূর্ণ পাবেন।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, আপনার স্ত্রী, সন্তান?

তিনি বললেন, তাদের যা যা প্রাপ্য, আমি সব ঠিক করে রেখেছি। শুধু আপনার সম্মতির অপেক্ষায়।

আমার জন্য তিনি জীবন দিতেও প্রস্তুত। অথচ আমি কখনো তাকে বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি। আমি আমার হাজব্যান্ডকে এতো ভালোবাসি যে, তার জায়গায় কাউকে কল্পনায়ও ভাবতে পারি না। আমার সমস্ত মন জুড়ে আছে আমার সন্তান, আমার হাজব্যান্ড। আমার হাজবেড একজন আদর্শ মানুষ। তাকে আমি শুধু ভালোই বাসি না, শ্রদ্ধাও করি। তার জন্যই আমার সমস্ত মন প্রাণ। সে জায়গায় অন্য কেউ, প্রশ্নই আসে না।

আর আমার বস সুযোগ পেলে তার মনের কথা বলেন।

আমি তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি, এটা অসম্ভব, কখনো সম্ভব না। একতরফা কোনো কিছু সম্ভব না। আরো অনেক কথা।

তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বোঝাতে হবে না, আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমার জয় হবেই। আমি ধৈর্য ধরবো। আমি আমার ভালোবাসাকে জয় করবোই।

আমি জানি, এটা কখনো সম্ভব নয়।

আমার জন্য তিনি নাকি কখনো ছুটিও নেননি। আমি যেখানে বদলি হবো সেখানেও নাকি তিনি বদলি হবেন।

আমি জানি সে ক্ষমতা তিনি রাখেন।

একদিন শোনালেন, পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমেরিকায় যাচ্ছেন। ওখানে নাকি সিটিজেনশিপ পেয়েছেন।

ভাবলাম এবার বাচা গেল।

কিন্তু তিনি তিন মাস পর আবার ফিরে আসবেন। আমাকে ছাড়া তিনি থাকতে পারবেন না। তাই তাদেরকে ওখানে সেটল করিয়ে চলে আসবেন।

এতো গেল বসের কথা। এখন আমার কথা শোন।

বসের এতোসব পাগলামি আমাকেও যেন দুর্বল করে তুললো। বিদেশ যাবেন শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। তাকে আমি ভালোবাসি না। তাকে পাওয়ার কথা কখনো ভাবিনি। তার জন্য কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করিনি বা তা করার মনমানসিকতাও নেই। তারপরও কোথায় যেন তার জন্য একটা টান অনুভব করি। নিজেকে প্রশ্ন করি, তবে কি আমি তাকে ভালোবাসি? উত্তর খুঁজে পাই, না, তা কখনো না। তাহলে তার জন্য আমার মন অস্থির হয় কেন? আমি যখন আমার হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে থাকি, বসের জন্য তো কোনো টান অনুভব করি না! তবে কি এটা বন্ধুত্ব? না, তাও না। বন্ধুত্ব তো বিশাল ব্যাপার, যার সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করা যায়। তবে কি পরকীয়া প্রেম? না, তাও নয়। কারণ আমি তাকে ভালোবাসি না অথবা ভালোবাসা অনুভবও করি না। তার শূন্যতা শুধু অফিসে অনুভব করি। অন্য কোথাও না। আসলে আমার আর বসের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্কের নাম কি? আমি খুঁজে পাই না।

ছুটি নিয়ে অনেক দিন বাসায় ছিলাম। কিন্তু যখন অফিসে গেলাম, আবার আগের মতো তাকে অনুভব করলাম। কতো ভাবি তার সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথা বলবো না, তাকাবো না। কিন্তু তিনি এসে যখন কথা বলেন তখন আর ঠিক থাকতে পারি না। কতো কিছু ঠিক করি। যতো কিছু সিদ্ধান্ত নিই, ততোই যেন অফিসে তাকে বেশি অনুভব করি। আমি জানি এ ধরনের অবস্থায় থাকা অন্যায্য।

তাকে অনেকভাবে নিরাশ করতে চেষ্টা করেছি। এড়িয়ে চলেছি। পারতপক্ষে রুমেও বসি না। তাতে তার কোনো পরিবর্তন নেই।

বলেন, যতো কিছু করেন, শোনান বা বোঝাতে চেষ্টা করেন, আমার একটাই কথা, রীনা আমার। আরো বলেন, আমি আপনাকে কোনো রকম খারাপ কথা বলি না, ডিসটার্ব করি না, এমনকি আপনার টেবিলের কাছেও বসি না। শুধু এতোটুকু জানি, আপনাকে ছাড়া আমি ভাবতে পারি না।

সত্যি, তিনি কখনো খারাপ কিছু বলেন না, আমাকে কোনোভাবেই উত্যক্ত করেন না।

এখন বল, এমন পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত? তোর পরামর্শ চাচ্ছি।

পাঠকবৃন্দ, শুনলেন তো আমার বান্ধবীর কথা? এ ধরনের সমস্যা আরো অফিসে কাজ করেন এমন অনেক মহিলাদের মধ্যে আছে। প্রকাশ পেলে সমস্যা আরো সৃষ্টি হতে পারে এ আশংকায় প্রকাশ করেন না।

চাকরিজীবী মহিলাদের স্বামীরা এ সমস্যার সুন্দর সমাধান দিতে পারেন।

ঢাকা থেকে

দুঃখিনী

– অনামিকা

সম্পাদক সাহেব,

আমি একজন পতিতা। সমাজে আমি অতিশয় ঘৃণিত ও নিন্দিত। অথচ কোনো ভদ্রঘরে বিয়ে হলে আমিই হতে পারতাম সম্মানিত এক গৃহবধূ। সে জন্য এখন দুঃখ করে লাভ নেই। তবে আমি এই ঘৃণিত জীবন নিজে বেছে নেইনি। আমাকে এ পথে আনা হয়েছে। এতোদিন আমার এই বুকের মধ্যে জানানো কথাগুলো কাউকেই বলিনি। কিন্তু আজ আমার কথাগুলো যাযাদি-কে লিখতে মনে চাইছে। জানি না আমার এই একান্ত গোপনীয় কথাগুলো আপনারা ছাপাবেন কি না? তবুও আশা করবো দুঃখিনীর হৃদয়ের একান্ত কথাগুলো ছাপাবেন।

ইতি

অনামিকা

মাগুরা থেকে

আমি তখন পনেরো বছর বয়সের এক কিশোরী। দেখতে খুব খারাপ ছিলাম তা বলবো না। ছাত্রী হিসেবেও খুব খারাপ ছিলাম না। সেই পনেরো বছরের এক কিশোরী হিসেবে আমার মনেও চঞ্চলতা দেখা দিতো। এই সময়ে একটি ছেলেকে আমার ভালো লাগতে থাকে। সে আমাদের পাড়ারই ছেলে ছিল। তার নাম ছিল মিরন। সে তখন কলেজে পড়তো। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। দেখা হলে তার সঙ্গে কথা বলতাম। তার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতাম। আমার বাবা-মাও তাকে ভালো ছেলে হিসেবে জানতেন। তার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমার বাবা-মা তাকে আমার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। আমিও তাকে গৃহশিক্ষক হিসেবে মেনে নিই।

সে নিয়মিত আমাকে পড়াতে আসতো। পড়ানোর ফাকে ফাকে সে দুই একটি প্রেমের বুলিও আওড়াতো। কিন্তু তার সঙ্গে আমি প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে চাইতাম না। কেননা সে ছিল বিধর্মী। তবুও আমাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিছুদিন এ সম্পর্ক চলার পর তা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে।

একদিন পড়াতে এসে সে প্রেমালাপের সঙ্গে হঠাৎ করে আমার স্তনে হাত রাখে আর বলে, প্রিয়তমা, আমাকে কবে বিয়ে করবে?

তারপর একদিন সন্ধ্যায় সে আমার বাসায় পড়াতে আসে। সেদিন আমার ঠাকুরমার অসুস্থতার কথা শুনে আমার বাবা মা ঠাকুরমাকে দেখতে যান। আমি বাড়িতে থেকে যাই। সেদিন মিরন প্রস্তাব দিল দৈহিক সম্পর্কে যাবার।

আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তবুও মত দিলাম। একে একে সে আমার জামা, পায়জামা, ব্রেসিয়ার গা থেকে খুলে দিল। আমিও তাকে নিরাবরণ করে দিই। তারপর দুজনে হারিয়ে যাই সুখের ঠিকানায়। সারা রাত চলে আমাদের সুখের খেলা।

ভোরে সে চলে যায়।

এ রকম ঘটনা আরো কিছুদিন চলে।

হঠাৎ আমার বাবা মা ব্যাপারটা টের পেতে থাকেন। আমার বাবা মা আমাদের বাড়িতে মিরনের আসা বন্ধ করে দেন। ফলে পালিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতাম।

একদিন মিরন আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। আমিও অনেক ভেবে রাজি হয়ে যাই। এক রাতে আমরা কুষ্টিয়া থেকে পালিয়ে মাগুরাতে আসি। তারপর আমরা কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করি। এরপর মিরন বহু কষ্ট করে তার এক বন্ধুর সাহায্যে এক সিগারেট কম্পানিতে চাকরি নেয়। দুই বছর সুখেই পার হয়।

তারপর একদিন মিরনের চাকরি চলে যায়। সংসারে অভাব নামে। কোনো উপায় না দেখে মিরন আমাকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। প্রথমে সে তার বন্ধুদের দিয়ে আমার ওপর যৌন নিপীড়ন চালাতো। বিনিময়ে সে তাদের কাছ থেকে টাকা নিতো। একদিন সে আমাকে মাগুরার পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন বাচার তাগিদে আমাকে সেখানে থাকতে হয়। কিন্তু মাগুরার পতিতালয় উচ্ছেদের পরও আমি মাগুরাতে থেকে যাই।

এখন আমি এক বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করছি। সবাই এখন আমাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

তাই সকলের কাছে আমার মিনতি, সব সময় মিরনের মতো ভণ্ড প্রেমিকদের থেকে দূরে থাকুন।

মাগুরা থেকে, পূর্ণ ঠিকানা বিহীন

পরিমাণ

- মোহাম্মদ আল-মাসুদ

এখন আমি ও আমার বন্ধু বাপ্পি দুজনেই কলেজে পড়ি। আমাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। এক কথায় বেস্ট ফ্রেন্ড। সে অন্তরা নামের একটি মেয়েকে অন্ধের মতো ভালোবাসে। অন্তরা যে অপরাধী সুন্দরী তা নয়। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। তবে মুখটা দেখতে সুন্দর। হাসলে আরো সুন্দর লাগে।

যখন বাপ্পি প্রাইমারি স্কুলে পড়তো তখন থেকে অন্তরাকে পছন্দ করতো। অন্তরা ছিল ধনীরা একমাত্র মেয়ে এবং স্কুলের মধ্যে ভালো ছাত্রী। বাপ্পি যতো বড় হতে লাগলো ততো অন্তরার প্রতি আসক্ত হতে লাগলো।

দেখতে দেখতে প্রাইমারি স্কুলের জীবন শেষ হলো এবং হাই স্কুল জীবন শুরু হলো। হাই স্কুলে উঠে বাপ্পি অসুবিধায় পড়লো। কারণ অন্তরা গার্লস স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তবে আমাদের স্কুলের রাস্তার সামনে দিয়ে অন্তরাকে গার্লস স্কুলে যাওয়া-আসা করতে হতো। ফলে অন্তরাকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বাপ্পি এক মুহূর্ত দেখার জন্য আমাদের স্কুলের রাস্তায় অপেক্ষা করতো। এমনকি ঝড়-বৃষ্টির দিনও অন্তরাকে দেখার জন্য স্কুলে আসতো। আমাদের স্কুলে সর্বোচ্চ উপস্থিতি হওয়ার জন্য তিনবার পুরস্কার পেয়েছে।

বাপ্পি অনেকবার চেষ্টা করেছে অন্তরার সঙ্গে কথা বলতে।

কিন্তু অন্তরা কোনো সাড়া দেয়নি। করেনি তার চাওয়া-পাওয়া ও ভালোবাসার মূল্যায়ন। বরং অন্তরা অন্যান্য বান্ধবীকে দিয়ে হেয় করার চেষ্টা করেছে, এমনকি বড় খালাতো ভাইকে দিয়ে পেটানোর চেষ্টা করেছে কয়েকবার।

অন্তরাকে বাপ্পি এতোটা ভালোবাসতো যে, তার হাতে এসিড দিয়ে অন্তরার নাম লিখেছে। বাপ্পি আমাকে বলে, অন্তরাকে এনে দে বন্ধু। অন্তরাকে ছাড়া বাচবো না।

বাপ্পি পড়াশোনা করতো না, শুধু অন্তরার চিন্তা করতো। প্রতিটা প্রতীক্ষায় থাকে কখন অন্তরার সঙ্গে দেখা হবে।

এভাবে দেখতে দেখতে এসএসসি পরীক্ষা চলে এলো এবং যথাসময়ে ফলাফল বের হলো। আমি ও অন্তরা পাস করলাম, কিন্তু বাপ্পি ফেল করলো এক বিষয়ে।

অন্তরা ভর্তি হয়েছে মহিলা কলেজে। অন্তরা এখন সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী এবং বাপ্পি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।

দিনে দিনে অন্তরাকে না পেয়ে বাপ্পি খারাপ হতে লাগলো। শুরু করলো সিগারেট খাওয়া। এমনকি মাদকের দিকে পা বাড়িয়েছে।

বাপ্পি একদিন সিগারেট খাচ্ছিল। রাগ করে বাপ্পিকে বললাম, তোর অন্তরা মরে যাক, তোকে যে একটুও পছন্দ করে না তাকে তুই অতো ভালোবাসিস কেন?

এ কথা বলতেই সিগারেট দিয়ে আমার হাতে ছেকা দিল।

কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলাম না, শুধু ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম আর ভাবলাম হায়রে ভালোবাসা ...!

ব্যর্থ প্রেমের গায়ক আসিফ তার প্রিয় গায়ক। আসিফের প্রতি এতোটা ভক্ত যে, অন্য কোনো গায়কের গান শোনে না। আসিফের এমন কোনো গানের অ্যালবাম নেই যে, বাপ্পির কাছে নেই।

সিগারেট ও আসিফের গান হয়েছে বাপ্পির প্রিয় সঙ্গী।

কি জন্য বাপ্পির এই পরিবর্তন, কোনোভাবেই বাপ্পির বাবা মা বুঝে উঠতে পারছেন। আমিও বাপ্পির বাবা-মাকে সব কথা খুলে বলতে পারছি না।

আমি এইটুকু বলবো, ভালোবাসা ভালো। কিন্তু অন্ধ ভালোবাসা ভালো নয়।

পাচবিবি, জয়পুরহাট থেকে

পছন্দের মানুষ

– আইয়ুব আহমেদ

নাহিদার স্মৃতি বুকে নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে আমার দিন কাটছিল। কেউ আমার কষ্ট বুঝতে চাইতো না। তার প্রেরণায় থ্যাজুয়েশন ও চাকরিসহ বাবার দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেও বাবা-মাকে রাজি করতে পারিনি। মনের কষ্টে বন্ধুদের পাশে পড়ে একদা রাতভর ডংক করেছিলাম। কিন্তু তাতে কি আর কষ্ট দূর হয়? সেন্স আগের মতোই থাকে। বুঝলাম ডংক করে মাতলামি করাটা একটা ভুয়া বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মহত্যা করার মতো সাহস আমার ছিল না।

আমার দূরবস্থা দেখে চরম দুঃসময়ে এসে পাশে দাড়ালো মামাতো বোন। তার প্রশ্নে বাচার তাগিদে এবং পরিবারের জন্য আমার বিসর্জন ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নিজের মনটাকে পুনরায় ঘোরানোর চেষ্টা করলাম তার দিকে।

ততোদিনে সে ক্লাস নাইনের ছাত্রী। সব কিছু জেনেও সে আমাকে ভালোবাসার ছায়া দিল, মায়া দিল, প্রেরণা দিল।

একদিকে বাবার একরোখা আচরণ, অন্যদিকে মামাতো বোনের গভীর প্রেরণায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একদিন প্রবাসী হলাম। আপন পায়ে সোজা হয়ে দাড়ালাম এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম।

সে তখন অনার্সের ছাত্রী।

কিন্তু বাবার আচরণ আগের মতোই একরোখা। তিনি শুধু বোঝেন টাকা আর সম্পত্তি। বিশ্বাস্যকর হলেও সত্য যে, তার এ স্বভাব আগে কখনোই ছিল না। গ্রামে তারই সতীর্থদের উত্তরোত্তর আর্থিক উন্নতিই হলো মূল ঈর্ষা।

তাই বাবার ঈর্ষান্বিত মনোভাব পরিবর্তন করার জন্যে নিজের সব কামাই হাতে তুলে দিয়েছি। বলেছি, অন্যের সম্পদ নয়, বরং আমার বিসর্জন, শ্রম, শ্রদ্ধাবোধ এসব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। শ্রমের জন্যে আমি প্রস্তুত। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

পারিবারিক চক্রান্তের শিকার হলাম। বাবা গিয়ে মামা-মামির গোষ্ঠি উদ্ধার করলেন।

ফলে আমার বেচে থাকাটাও যেন নাজায়েজ হয়ে গেল। একেই বলে পিতা-পুত্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক। হয়তো বা সমাজে পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব এসব কারণেই ঘটে থাকে।

আসলে বাবা-মাকে বোধহয় একটু বেশিই ভালোবাসি, এটাই ছিল আমার অপরাধ। সেই জন্যে আমার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আমার ভালো লাগা, চাওয়া-পাওয়া, আমার সুখ সব কিছুকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। তবে হ্যাঁ, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো আঙুল তুলে বাপের নাকের ডগায় চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে পারতাম তাহলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ভালোবাসার মতো সকল ধরনের স্বাধীনতা হাসিল করতে পারতাম। তারপরেও কষ্ট পেতাম না যদি সান্ত্বনা পাওয়ার মতো জীবনে একটি ন্যূনতম মাধ্যম পেতাম।

বদনসিব আমার! এমন পরিস্থিতিতে কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

মামা-মামিকে অপমান করার অপরাধে সেও অভিমান করলো। আমাকে পরামর্শ দানে বিরত রইলো।

পালিয়ে বিয়ে করবো, তাও পারছি না। কারণ আমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় হলো মা ও মামা। তাদের কষ্ট দিতে পারি না।

এদিকে মা ও মামার দুর্বলতাকে কাজ লাগিয়েছেন আমার বাবা ও মামি।

তাদের রেষারেষির জের হিসেবে জেদ করে সমুদ্রের দুই কূলে নয়, বরং মাঝখানে (অন্যত্র) বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। দেখিয়ে দিলাম যে, সম্পত্তি আমার কাছে মূল্যহীন।

কিন্তু মূলত কি পেলাম? মানসিক শান্তি, বিয়ের মজা, শ্বশুরবাড়ির মজা, জীবনের মজা, যৌবনের মজা কোনোটাই পেলাম না। এসব পেতে হলে যে ভালো লাগা বা ভালোবাসার প্রয়োজন, তা আমার নেই। হৃদয় শূন্য হয়ে গেছে বহু আগেই।

সকল অবিবাহিত পাঠকের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, যেভাবেই হোক নিজের পছন্দের মানুষটাকেই বিয়ে করুন। নাহলে সারাটা জীবন বাধ্যতামূলক ভালোবাসা দিতে হবে।

ayub@mets.com.sa

বাসনা

- লুনা

মানুষের ভালোবাসা কতো রকম না হতে পারে। বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজনকে তো ভালোবাসবেই এটা তো একটা গতানুগতিক ব্যাপার।

আমি যাকে মনে প্রাণে ভালোবাসি ও যার আদর্শে জীবনকে পরিচালিত করে চলেছি তিনি হলেন প্রাণপ্রিয় নেতা জিয়াউর রহমান। তিনি যখন ক্ষমতায় তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি এবং ওই বছরই শহীদ হন। গণমানুষের মুখে প্রিয় নেতার সততা, দেশপ্রেমের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রিয় নেতা হিসেবে ভালোবেসেছিলাম। মৃত্যুর খবর যখন শুনি তখন দেখেছি গ্রামবাংলার বেশির ভাগ মানুষই প্রিয় নেতার জন্য কাদছে। তাদের কাদতে দেখে আমিও কেদেছিলাম। সেই থেকে ঊনত্রিশ বছর জীবনে প্রিয় নেতার পথ অনুসরণ করে চলেছি। বিশেষ করে ২০০১ সালের অক্টোবরের ইলেকশনে যাদাদির আহ্বান ছিল ভোট বিপ্লবের জন্য। এই আহ্বানকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য ঘরগি হয়েও উঠেপড়ে লেগে যাই।

গত পাচটি বছর প্রায় আওয়ামী নির্যাতন ও নিষ্পেশন থেকে মুক্তি পেতে হলে ধানের শীষে ভোট দেয়া ছাড়া কোনো গতি নেই। ঘরে ঘরে গিয়ে প্রিয় নেত্রীর জন্য ভোট চেয়েছি। কেউ মানে, নেতা গোছের কারো কথায় ভোট চাইতে যাইনি। আমার নিজের তাগিদে এবং কেন যেন মনে হয়েছিল এ কাজটি আমাকে করতেই হবে আমার প্রিয় নেত্রীর জন্য। কারণ প্রিয় নেত্রী খালেদা জিয়া আমার এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। সুতরাং তাকে জয়যুক্ত করতে হবে। আমি সেভাবে কাজ করেছি রাত-দিন যতোটা সময় পেয়েছি।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, যার জন্য এতো ভালোবাসা ও ত্যাগ স্বীকার, আমার প্রিয় নেত্রীকে কখনো কাছ থেকে দেখার ভাগ্য হয়নি। ছবি দেখে তাকে ভালোবেসে চলেছি। ছাত্রী জীবনে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বিয়ে হওয়ায় রাজনীতিতে কলেজ জীবনে ছিলাম সহযোগী হয়ে। এভাবে অনুষ্ঠানে সভায় বক্তৃতা দেইনি বটে তবে দলের সুদিনে-দুর্দিনে খুব কাছ থেকে দলের জন্য কাজ করেছি শুধু নেত্রীর প্রতি ভালোবাসা থেকে। অনেক দিনের ইচ্ছা-বাসনা নেত্রীকে দেখার। কিন্তু আমার ভাগ্যে আজও হয়ে ওঠেনি। তবে আমি নিরাশ নই, ভাবি একদিন হয়তো তাকে দেখতে পাবো খুব কাছ থেকে এবং কথা বলতে পারবো।

আজ প্রায় এক বছর হতে চললো, আমি খুব অসুস্থ। ডাক্তার দেখাচ্ছি, ওষুধ খাচ্ছি। তাতে তেমন ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। দিন যাচ্ছে, কেবলই মনে হচ্ছে আমি আর বেশি দিন বাচবো না। ভাবি এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, তোমার শেষ ইচ্ছা কি? আমি শুধু চাইতাম, আমার প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে দেখবো। পরক্ষণে ভাবি আমার চাওয়া, না চাওয়ায় কি হবে! কেউ তো জানবে না। তাই প্রিয় যাযাদি-র কাছে আমার মনের বাসনার কথা জানালাম। জানি না আমার মনের বাসনা পূরণ হবে কি না।

বয়রা, খুলনা থেকে

হায় মোনালিসা

– রেজাউল করিম

বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের পটভূমিকায় লেখা *আমরা তিনজন* গল্পটি যারা পড়েছেন তাদের হয়তোবা মনে আছে *মোনালিসা*-র কথা। লেখক এবং তার আরো দুই বন্ধু মিলে তাদের এলাকায় নতুন আসা মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলেন। তখন তাদের কিশোর বয়স, বৃকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করে ওঠার মতো ঢেউ, অজানা, অস্পষ্ট, অস্ফুট একটা ভালোবাসা। সে গল্পটি পড়ে আমিও শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম উঠতি বয়সে।

আমার কৈশোরের পেরিয়ে যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে গল্পটির চরিত্রগুলো আমাকে আপ্ত করেছিল, অসংখ্য গল্প কাহিনীর মতো এ গল্পটিও হয়তো থেমে যেতে পারতো ক্ষণিক ভালো লাগার দুটিটুকু ছড়িয়ে। ইতিহাস হয়ে যেতে পারতো পরবর্তী বছরগুলোর ব্যস্ততার মাঝে।

কিন্তু তা হয়নি। গল্পের সেই মোনালিসার মতো আরেক মানবী আমাদের জীবনেও এসেছিল, আমরাও সেই তিনজন!

আমরা তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তখন সবেমাত্র এইচএসসি পাস করেছি। আড্ডা, বেড়ানো, কনসার্ট দেখা ইত্যাদি মিলিয়ে বেশ কাটছিল আমাদের দিনগুলো। এইচএসসি-তে ভালো ফল করায় তিনজনের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো বুয়েটে। তখন ঢাকার মৌচাকে একটা কোচিং সেন্টার খুলেছিল। আমাদেরই সিনিয়র ভাইয়েরা সেটা চালাতেন।

আনন্দ আর উদ্দীপনা নিয়ে ভর্তি হলাম সেই কোচিং সেন্টারে। জীবনে কখনো কো-এডুকেশনে পড়িনি। এখানে এসে দেখলাম নানান ধরনের ছেলের পাশাপাশি বাকঝাকে চেহারার বেশ কিছু মেয়ে ক্লাস করতে এসেছে। শিক্ষকদের মধ্যেও তরুণী সুন্দরী মেয়েরা ছিল। সব মিলিয়ে বেশ একটা রমরমা পরিবেশ যেন রমনা বটমূলে বৈশাখের অনুষ্ঠান।

আমরা তিন বন্ধু পাশাপাশি বসে ক্লাস করি আর কখনো আড়ে আড়ে মেয়েদের দিকে তাকাই। আগেই বলেছি, আমরা কেউ-ই আগে কখনো মেয়েদের সঙ্গে ততোটা মিশিনি। তাই ক্লাসের মেয়েগুলোর সঙ্গে কিভাবে সহজ হওয়া যায় তা বুঝতে পারছিলাম না। তবে ওদের মধ্যে অনেকেরই ইংরেজিতে চৌকস কথাবার্তা, হই

হল্লোড় আর প্রগলভতা আমরা অতি আশ্রয়ে উপভোগ করতাম। পাশাপাশি এক ধরনের হীনমন্যতায়। ভেতরে ভেতরে সিটিয়ে থাকতাম। (এর উৎস কোথায় জানতাম না)

আমাদের সামনের বেঞ্চে যে মেয়েগুলো বসতো তাদের মধ্যে একটি মেয়ে নিজ থেকেই একদিন আমাদের সঙ্গে কথা বললো। আর কথা মানে কি, সাপ্তাহিক পরীক্ষার একটি প্রশ্নের উত্তর চুপিচুপি জানতে চাইলো।

সঠিক উত্তর আমি বা আমরা দিতে পেরেছিলাম কি না আজ ভুলে গেছি। তবে ঘাড় ঘুরিয়ে পুরূ লেন্সের চশমার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে মেয়েটি যখন ফিশফিশ করে কথা বলছিল তখন আমার (পরে জেনেছিলাম ওদেরও) বুকের মধ্যে যেন সহস্র বছর খরার পর আনন্দদায়িনী বৃষ্টির মতো শব্দসুধা সিঞ্চিত হতে লাগলো। মনে হচ্ছিল অনন্তকাল ধরে পরীক্ষাটা চলুক, মেয়েটি কিছুই না পেরে শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে থাকুক ঠিক এই ভাবে।

এরপর থেকে সে আমাদের সঙ্গে কিছুটা সহজ হয়ে গেল।

ওর *ন্যাকা ন্যাকা* কথা আমরা খুব উপভোগ করতাম। আড়ালে ওকে আমরা *ন্যাকা* বলেই ডাকতাম। মেয়েটির ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথোপকথন আমাদের খুব ভালো লাগতো। দিনে দিনে ওর শরীরের প্রতিটি বাক আমাদের মুখস্থ হয়ে যেতে লাগলো।

আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, একই পোশাক সে কখনো আর অন্যদিন পরে আসতো না। কিছু কিছু জামা ছিল বেশ স্বচ্ছ। সেই পাতলা জামার পেছন থেকে ওর ব্রা-র ফিতা আমাদের চুষকের মতো আকর্ষণ করতো। আবার যেহেতু ওকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে দিয়েছি, তাই সহজেই চোখ ফিরিয়ে নিতাম এই ভেবে যে, এতে ওকে ছোট করা হয়।

প্রতি সপ্তাহেই আমাদের পরীক্ষা থাকতো। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তুতি পরীক্ষা। সুতরাং প্রশ্ন বেশ কঠিন হতো। সে জন্য বাসায় বেশ পড়াশোনা করতে হতো। তবু এর মধ্যেই নিজের অজান্তে ভেসে উঠতো সেই মুখটি। মনে হতো, কবে আবার ক্লাসে যাবো সেই চোখ দুটি আরেকটিবার দেখার জন্য।

পর পর কয়েকদিন তার দেখা নেই। ঔৎসুক্য আর অস্থিরতা আমাদের চোখে মুখে। ক্লাস করি ঠিকই, চোখ দুটো সারাক্ষণ তাকে খুঁজে ফেরে।

অবশেষে প্রায় এক সপ্তাহ পর সে এলো। পরনে হাল ফ্যাশনের পোশাক। তবে মুখটা একটু ম্লিয়মাণ। সেদিন অন্য বন্ধু দুজন একটু পিছিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল।

এমন সময়ে সে এগিয়ে এসে আমায় বললো, সে আরো কদিন ক্লাস করতে পারবে না। অসুস্থ। আমি যদি ওকে ক্লাসের পড়াগুলো জানিয়ে দিই আর আমার পরীক্ষার খাতাগুলো (যা টিচাররা দেখার পর আমাদের ফেরত দিয়ে দিতেন) ওকে দেখতে দিই তবে সে ভীষণ খুশি হবে।

কিভাবে পড়া জানাবো বলতেই ও গড় গড় করে ওদের ফোন নাম্বার আমাকে দিল।

দুরূদুরূ বুক কেউ না দেখে ফেলে এভাবে নাম্বারটা হাতের তালুতে লিখে নিলাম।

এরপর আমাদের মধ্যে প্রায়ই ফোনে কথা হতো। আমিই ফোন করতাম।

যেদিন কথা হতো সেদিনটা হয়ে যেতো অমর। যেন বা বসন্তের গানে ভেসে যাওয়া কোনো ইন্দ্রনীল গ্রহর। দুই বন্ধুকে সেসব কথা বলতাম দাড়ি-কমা, সেমিকোলনসহ। আমাদের মধ্যে কোনো রোমান্টিক সংলাপ বিনিময় হতো না। তবুও যতোক্ষণ কথা বলতাম ততোক্ষণ এবং পরে সারাক্ষণ তার রেশ আমার অবয়ব ঘিরে থাকতো মিষ্টি কোনো সুগন্ধীর মতো।

এর মধ্যে একদিন ওকে দেখার ভীষণ ইচ্ছে হলো। ওর কাছে আমার কয়েকটি খাতা ছিল। মিথ্যে করে বললাম, ওগুলো দরকার।

ও তখনো কিছুটা অসুস্থ ছিল। তবুও পরদিন সে এলো ভাইয়ের সঙ্গে।

সেদিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে সে আমার খাতাগুলো ফেরত দিয়ে গেল আর বললো, তুমি চেয়েছো বলে জোড় করে ভাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বাসা থেকে আসতে দিতে চাইছিল না। এরপর ওর সঙ্গে আর কখনোই দেখা হয়নি। জানতে পারিনি ও বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল কি না। কারণ ও কখনোই আর কোচিংয়ে আসেনি। তবে আমরা তিন বন্ধুই বুয়েটে চাপ পেয়ে নতুন জীবনে, নতুন দিগন্তে ভেসে যেতে থাকি।

কোচিং সেন্টারের অন্য এক সহপাঠীর মাধ্যমে জানতে পারি মেয়েটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আমার অন্য দুই বন্ধু বুয়েটে পড়ার সময় কখনোই আর মেয়েটির কথা তোলেনি।

আমরা সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে জীবনের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত হয়ে গেছি। তিনজনের মধ্যে আমরা দুজন আমেরিকায়, অন্য এক বন্ধু সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আমলা।

বহু বছর পরে আমেরিকায় বসে এনটিভি-তে *আজকের সকাল* অনুষ্ঠানটিতে পুরু চশমা আর অন্য রকম, অথচ যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি। হ্যা, এই তো! সে এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রভাষিকা। অনুষ্ঠানটিতে অতিথি হয়ে এসেছে। স্ত্রীকে ডেকে বললাম, দেখো আমরা তিন বন্ধু এক সময় এক সঙ্গে এই মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলাম।

আমাদের বিয়ের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। কৈশোর আর তারুণ্যের সন্ধিক্ষণের সেই ভালো লাগা জানি না আমার স্ত্রীকে ঈর্ষান্বিত করেছিল কি না? দুই বন্ধুও আজ ব্যস্ত পেশা এবং সংসার নিয়ে। শুধু বুদ্ধদেব বসুর মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করে, *হায় মোনালিসা, আমি ছাড়া আর তোমায় মনে রেখেছে কে?*

নিউ ইয়র্ক থেকে

মৌ চোর

- সেলিমা সুলতানা

এক.

রাতে বিছানায় শুয়ে বেনু আর মিজানের কথা হচ্ছিল।

বেনু আহ্লাদি গলায় বললো,

এই, তুমি এতো রাত করে বাড়ি ফেরো কেন? আমার ভয় করে।

কিসের ভয়?

কতো কিছুর। এই, সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো!

কেন তোমার সন্দেহ আছে?

না, তা নয়। তবে তোমাকে নিয়ে ভয় লাগে।

কেন?

সবাই যে বলে তুমি নাকি মেয়েদের মহলে খুব পরিচিত। সবাই তোমাকে নাকি দারুণ পছন্দ করে। তুমি খুব সহজেই মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারো।

আর কি কি বলে সবাই?

ধুর।

তুমি আমাকে পছন্দ করো না? বেনুর গালে আলতো টোকা মেরে মিজান জিজ্ঞাসা করলো।

আমি তো করিই। না হলে আর সবাইকে ছেড়ে, কারো নিষেধ না শুনে তোমাকে বিয়ে করলাম কেন?

তাহলে আর সন্দেহ কিসের?

তবু ভয় লাগে, তুমি যদি আর কাউকে ...।

শোনো বেনু রানী, বিশ্বাস হলো বড় কথা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস না থাকলে সংসার চলবে কি করে? সংসারের প্রথম কথাই হলো বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভিত্তি যদি ভাঙবে সেদিন সংসারও শেষ।

মিজানের গলা জড়িয়ে ধরলো বেনু। এমনি এমনি বললাম আর তিনি দর্শন আওড়াতে শুরু করলেন। তোমার ওপর বিশ্বাস আছে গো আছে।

বেনুকে গভীর করে মিজান কাছে টেনে নিল।

লাইটের সুইচ অফ হয়ে গেল।

দুই.

জানালার একপাশটা একটু ফাক থাকে। ভালো মতো লাগে না। বাইরে থেকে আলো আসে। অথবা চোখ রাখলে দেখাও যেতে পারে। মিজান তোয়ালে দিয়ে ভালো করে ফাকটা বন্ধ করলো। কোনো রিস্ক নেয়া যাবে না।

খাটের ওপর বসেছিল নাজমা। বললো, ইশ; ঘরতো অন্ধকার হয়ে গেল!

মিজান দরজার ছিটকিনি তুলে দিতে দিতে বললো, একটা হালকা আলো জ্বালবো কি বল?

জানি না। লজ্জা মেশানো গলায় নাজমা উত্তর দিল।

তুমি চাইলে জ্বালবো। না হলে নয়। ঠিক আছে জ্বেলেই দিই। দেখবে কেমন রোমান্টিক আবহাওয়া তৈরি হয়ে যাবে।

বিছানায় নাজমার পাশে এসে বসলো মিজান।

নাজমা বললো, এই, তোমার বৌ কবে আসবে?

এই দুই একদিন পর। কাছেই তো ওর বাপের বাড়ি। একা থাকে। ইচ্ছা হলেই চলে যায়।

আর তুমিও সে সময়টা...

সে তো তুমি জানোই। বিয়ের আগে সুযোগটা একটু বেশি হতো।

বিয়ে করলে কেন বলো তো?

বাহ! বিয়ে করবো না! বিয়ের একটা সুবিধা আছে বুঝলে। মেয়েদের সংগে ঘুরলেও লোকে সন্দেহ করে কম।

তাই নাকি?

কেন তোমারও তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তুমিও তো বিয়ে করবে এখন।

তা তো করতেই হবে। আর কতোদিন না বলবো।

বিয়ের পরও এমনি আসবে তো?

জানি না।

এসো, এখন তাহলে একটু জানাজানি হোক।

তিন.

ব্যস্ত রাস্তায় শানুর হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছিল মিজান।

শানু বললো, হাত ছেড়ে দাও, কেউ দেখে ফেলবে।

এই ভিড়ে কার দেখার সময় আছে।

এখন বলো তো কোথায় যাচ্ছি আমরা?

রাস্তার ওপারে গিয়ে একটা রিকশায় উঠে মিজান বললো, কল্যাণপুর।

কেন? ওখানে কেন?

ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। বন্ধুটি বাড়ি গেছে। বন্ধুর ঘরের চাবিটা আমার কাছে। ঘরটির সদ্যবহার করা দরকার।

আমার ভয় করছে।

কেন?

তোমার বাসাটা অনেক সেফ মনে হয়।

এখানেও তো সেফ। কেউ দেখলেও চিনবে না। আমার ওখানে আমার বৌকে সবাই চেনে। এখন অন্য কেউ দেখলে আমাকে জবাব দিতে হবে। বৌকে বলেও দিতে পারে।

বিয়ের আগে এই সমস্যা ছিল না, তাই না?

হ্যাঁ। তখন চেনা কেউ দেখলে কলিগ বা পরিচিত বলে চালিয়ে দেয়া যেতো।

তা অবশ্য। আমি কিন্তু বেশি দেরি করবো না।

আরে না। আমারও কাজ আছে।

চার.

পর্দা ঢাকা ক্যাবিনে বসে আছে সুপ্তি আর মিজান। সামনে পরোটা ও মাংস।

সুপ্তি ঝোল দিয়ে পরোটার টুকরো ভিজাতে ভিজাতে বললো, আমাকে চারটার আগে অবশ্যই ফিরতে হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার আগেই যেতে পারবে।

মিজান পরোটার শেষ টুকরো মুখে দিয়ে পানি খেলো। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে বললো, চলো।

কোথায়?

রুমে।

হোটেলের রুমে ঢুকে দরজা লক করে দিল মিজান।

সুপ্তি বললো, আমার ভয় করছে। ম্যানেজার যদি সন্দেহ করে!

না, না। আসল নাম কি আর হোটেলের খাতায় দিয়েছি? ব্যাটা ম্যানেজার জানে দুই দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছি। দুই দিনের টাকা নিয়েছে গুণে গুণে। ঘণ্টাখানেক পরেই তো বেরিয়ে যাবো।

সুপ্তি বললো, তোমার বিয়ের পরই এসব ঝামেলা করতে হচ্ছে।

ওসব কিছু না। মিজান আশ্বস্ত করে সুপ্তিকে।

ঘণ্টা খানেক পর রাস্তায় নেমে সুপ্তি বললো, তুমি এতো সব ম্যানেজ করো কি করে? এই, তোমার কি আরো গার্লফ্রেন্ড আছে? মনে হয় তুমি আগেও এসেছো।

তোমার বিশ্বাস হয়? ঠিক আছে আমার আরো গার্লফ্রেন্ড আছে। মিজানের গলায় অভিমান ঝড়ে পরে।

এই, রাগ করলে? আমি এমনি এমনি বললাম। শোনো, সেদিন তোমাকে উত্তরায় দেখলাম। রাজলক্ষ্মীর লা/বাশা-র সামনে একটি লাল কামিজ পরা মেয়ের সঙ্গে দাড়িয়ে আছো। মেয়েটির কোকড়া কোকড়া চুল। আইসক্রিম খাচ্ছিল।

মিজান হেসে ফেললো, ও! তাই তোমার সন্দেহ হয়েছে? ও তো আমার কাজিন। চলো যাওয়া যাক।

একটা খালি সিএনজি চালিত ট্যাকসিতে ওরা দুজন উঠে বসে।

পাচ.

কলিংবেল বাজতেই সুমনা দরজা খুলে দিল।

মিজান টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

দরজা বন্ধ করে দুজনে সোফায় বসলো।

সুমনা বললো, মা আর ভাইয়া গেল গোড়ান। বড় চাচার অসুখ। যেতে-আসতে পাঁকা দুই আড়াই ঘণ্টা।

তুমি গেলে না?

হ্যা, আমাকেও যেতে বলছিলেন। টিউটোরিয়ালের দোহাই দিলাম। সকালে এসেই আমাদের কাজের বুয়াটা বললো, ওর ছেলের অসুখ। দুপুরে ছুটি দিতে হবে। তখন থেকেই মনে মনে প্ল্যান আটছিলাম।

সুমনার কোকড়ানো চুলে মিজান হাত রাখলো।

আহ! তোমার চুলগুলো কি সুন্দর। মনে হয় নদীর তিরতিরে ঢেউ।

মিজানের হাত নিজের হাতে নিয়ে সুমনা বললো, আইসকুম খাবে? ভালো আইসকুম আছে। ইগলুর কাপ, চকবার, ভ্যানিলা।

মিজান বললো, খাবো না।

এ একটা জায়গাতেই তোমার সঙ্গে আমার মেলে না।

মিজান বললো, তা নয়। পছন্দ করি আইসকুম। তবে দেখছো না, কেমন মোটা হয়ে যাচ্ছি।

একটু-আধটু খেলে কিছু হয় না।

কলিংবেল বেজে উঠলো।

মিজান চমকে উঠলো।

সুমনা হেসে বললো, দারোয়ান চাচা। তোমাকে ফোন করেই দারোয়ান চাচাকে বাইরে পাঠালাম। ওই কোণে গিয়ে চুপটি করে বসো।

সুমনা দরজা খুলে লন্ড্র কাপড়, এক বোতল কোক, প্যাটিস, চিপস ইত্যাদি এনে টেবিলে রাখলো। দরজা বন্ধ করে বললো, কতো যে চিন্তা ভাবনা করে সব সামলাতে হয়। তোমার বাসাটা খুব ভালো ছিল। এখন তো আর ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায় না। তোমার বৌ আছে।

মিজান কথা বললো না। শুধু বললো, চলো, ঘরে যাই।

ঘণ্টা খানকে পর সোফায় বসে মিজান কোকের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, এখন যাওয়া দরকার।

সুমনা দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যা। তবে দাড়াও। দারোয়ান চাচার ব্যবস্থা করি আগে। টের পেয়ে গেলে সর্বনাশ!

সুমনা কোকের বোতল আর কিছু টাকা দিয়ে দারোয়ানকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিল, কিছু কিনে আনতে। দারোয়ান চলে গেল। সুমনা আশপাশ দেখে নিয়ে মিজানকে বললো, হ্যা, এখন বের হতে পারো। উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে যাবে।

জানি, জানি। এই কি প্রথম এলাম তোমার বাসায়? আচ্ছা চলি। আবার দেখা হবে।

বাই।

মিজান হেসে হাত নেড়ে রাস্তায় নামলো। তারপর আর কোনোদিক না তাকিয়ে উল্টো পথে হন হন করে হাটতে শুরু করলো।

হয়.

দরজা খুলে দিল বেনু। হাসি মুখ করে বললো, আজ যে তাড়াতাড়ি? এখন তো মাত্র নয়টা। অন্যদিন তো এগারো, সাড়ে এগারোটার আগে তোমর মুখই দেখা যায় না।

মিজান ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বললো, আজ একটা খুব ভালো কাজ পেয়ে গেলাম। কাজটাও খুব ভালো মতো শেষ হলো। তাই শেষ হতেই বাড়ি।
বাহ! খুব ভালো। রোজ এমনি ভালো কাজ পেলে তো ভালোই হয়।
খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় এলো ওরা দুজন।
বেনু লাইটটা নিভিয়ে দিতে দিতে বললো, কি ব্যাপার, চুপ করে আছো যে? ভালো কাজ পেয়েছো, ভালো করে শেষ করেছো, সেলিব্রেট করবে না?
সেলিব্রেট? ও হ্যাঁ, সেলিব্রেট তো করেছিই।
রাখো তোমার হেয়ালি।
মিজানের গায়ে হাত রাখলো বেনু।
বেনুকে কাছে টেনে নিল মিজান। ওই কাজটার কথাই খুব মনে হচ্ছে। ক্লান্ত লাগছে। একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন?
বেশ তো, ঘুমাও।
মিজানকে জড়িয়ে ধরে বেনু পরম বিশ্বাসে ঘুমিয়ে পড়লো।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

শেষ দেখা

– মোহাম্মদ মানজারুল ইসলাম ওমর

হাজারো স্বপ্নে বিভোর, হঠাৎ চোখে পড়লো গুলিস্তান পোস্ট অফিস। ধানমন্ডি থেকে এসেছি। এখানেই নামতে হবে। যাবো নারায়ণগঞ্জ। উৎসব পরিবহনে টিকেট কাটতে গেলাম। টিকেট কেটে কাউন্টারের পাশেই দাড়ালাম, বেয়াই সঙ্গে। শত মানুষের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়লো অপূর্ব রূপবতী একটি মেয়ে। কিভাবে এসেছে, কোথা থেকে এসেছে কিছুই জানি না। কি আছে তার? কি আছে এমনটি ভাবছি না, কি নেই সেইটি নিরুপণের চেষ্টা চালাচ্ছি। হাতে একটি ব্যাগ।
না! বর্তমান সোসাইটির কাছে ঝোলানো ব্যাগ নয়, সাধারণ মানুষ। বাজার করতে যে ব্যাগ ব্যবহার করে তাই। থুঁ পিস পরেছে। বয়স অনুমান চোদ্দ পনেরো।
বাসে লোক উঠছে। পেছনের দিকে পাচ সাতটি সিট হয়তো খালি।
বেয়াই ওঠার জন্য ডাকলেন। বেয়াই অর্থাৎ আমার সঙ্গে লোক।
অজানা এক দর্শন শক্তি আমাকে এ বাসে উঠতে দিল না। বেয়াইকে সাফ বলে দিলাম, এ বাসে না, পরেরটায় যাবো। ওই যে মেয়েটি চোখের সামনে পড়েছিল, সে উঠতে যাচ্ছে বাসে।
আহ! পাঠক না লিখলে নয়। যার জন্য পরের বাসে, সে বাসের দিকে যায়।
কাছে গিয়ে আর উঠলো না।
ছেড়ে গেল...।
তাকেও হয়তো অজানা কোনো আবেগের আকর্ষণে চেপে ধরলো, যেতে পারলো না।
স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। হেটে গিয়ে মেয়েটির সামনে দাড়ালাম। দাড়ানোর যুক্তিটা এখানে, আমরা আগে টিকিট কেটেছি, আগে উঠবো।
ডান পাশে দাড়ানো মেয়েটি আমার সামনে থেকে বামে ঘুরে পেছনে দাড়ালো।

যখন সে ঘুরে দাড়ালো তখন গায়ের সঙ্গে কিছু মিশে গেল। সেই মিশে যাওয়াটা আমাকে সাহস যুগিয়েছিল। দিয়েছিল হাজারো বছরের প্রেরণা। দূর থেকে কাছে নিয়ে এসেছিল। দেখিয়েছিল আজ এ লেখার মতো হাজারো স্বপ্ন।

মিশে যাওয়াটাকে অন্য কিছু ভাববেন না। বিজলি আলোর মধ্যে কিছুটা অন্ধকার। তাই কেউ দেখলেও কিছু উপলব্ধি করতে পারেনি। বেয়াইকে নিয়ে উঠে গেলাম। পিছনে পিছনে সে আর তার সঙ্গের মহিলা উঠলো। মেয়েটি বসলো।

বেয়াইকে সামনে রেখে মেয়েটির ডান সাইডে পেছনে বসলাম।

লোক উঠছে।

ছোট গড়নে মেয়েটির দিকে আমার চোখ। তাকিয়েই রইলাম। এ তাকিয়ে থাকা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। কল্পজগতে কেটে যায় মাস, বছর, প্রেমের সাগরে যুগ বলতেও দ্বিধা নেই। প্রেম হয়, কথা হয়।

বাকা হয়ে যখন সে আমার দিকে তাকায় তখন মনে হয় এ কল্পনা মরীচিকা নয়। তার কল্পনায়ও হয়তো আমাকে নিয়ে পূর্ণতা পায়।

গাড়ির মৃদু আলো বন্ধ করে দিল। এখন এলো বাইরের আবেগময় বিজলি আলো। এ আবেগের ভালোবাসা কুণ্ণসিত কিছু নয়। গান শোনার আবেগ, ভালো লাগার আবেগ, বিরহের আবেগ। লোক কি বলবে! সেটি সত্যিকার অর্থে আচ করতে পারছি না। তাকে দেখছি তো দেখছিই। বাইরের আলো তার গালে, চোখে যখন স্নেহের পরশ বুলিয়ে যায় তখন কার না ভালো লাগে!

জানার বাইরে কি যেনো গোলমাল হলো পেছনে। সুযোগ মিললো আমাদের।

চোখের ভাষায় সে অনেক কথা বললো, মনে করিয়ে দিল নামতে হবে। ঠিকানা নিয়েছো? কোথায় দেখা হবে?

আমার নতুন কোড নামতে হবে।

তার মাথাটি সঙ্গের মহিলার কাধে ছেড়ে দিয়ে যেন বোঝানোর চেষ্টা করলো আমাকে ছাড়া নামবে না।

হঠাৎ বুদ্ধি করে বেয়াইকে বললাম, চাষাটা থেকে ফোন করে আসি। এ বলা ছাড়া উপায় খুঁজে পাইনি। চাষাটা গেল, নামতে পারলাম না। কালিবাজার গেল। তখন অনুভব করছি লোকে যেন বলছে, ছেলেটা এখনো নামে না কেন? কিন্তু সাহসী প্রেমিকের মতো নামিনি। অনেক চিন্তা করে এভাবে ঠিকানা সংগ্রহ করার উপায় বের করেছি।

রেলগেট। সবাই নামতে শুরু করেছে। এরপরে বাস মনে হয় যাবে না।

এতোক্ষণে সুন্দরী মাথা তুলেছে চোখ খুলেই বাক্যভাবে আমার দিকে তাকিয়ে, সে কি এক অদ্ভুত হাসি! এতো তৃপ্তি অন্য কোনো ধন্যবাদে কোনোদিন পাইনি যেটি তার হাসিতে পেয়েছি।

সকলের নামা শেষ। মেয়েটি, আমি, ওর সঙ্গের মহিলা বাকি।

বাধ্য হয়ে আমাকে সামনে সামনে নামতে হলো। পেছন থেকে পিঠে একটি ঠ্যালা আমার প্রাপ্য আমাকে আবারো দিল।

তারা রিকশা নিল। বাক্যভাবে তাকিয়ে রইলো।

আমার ধারণা ছিল, পেছনে আমিও রিকশা নিয়ে চলে যাবো। রিকশা পেতে সামান্য কিছু দেরি হলো আমার। এতোক্ষণে চেয়ে থেকেই হয়তো বিলীন হলো সে আমার চোখ থেকে। হাজারো রিকশা, গোলচত্বর ভেদে বের করতে পারলাম না তাকে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

ভেন্দু

– অনাদিতা

ক্লাস সিলে ওঠার পরই একটা উডু উডু ভাব এসে গেল। যাকে দেখি তাকেই ভালো লাগে। মহা যন্ত্রণা! রেজাল্টও ভালো হলো না।

সেভেনে ওঠার পরই আমাদের এলাকার এক ভাইয়াকে ভালো লেগে গেল। আমার চেয়ে প্রায় পাচ ছয় বছরের বড় হবে।

তখন বিকেলে হাটার অভ্যাস ছিল। তাই প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতো। রাতে তাকে স্বপ্নে দেখা শুরু করলাম। সে বছরই ঋত্বিক বলিউডে এসেছে। প্রচণ্ড ভক্ত ছিলাম এবং এখনো আছি। আমার রুমের প্রত্যেক জায়গায় ছিল তার পোস্টার। পোস্টারগুলোর পেছনটায় সেই ভাইয়ার নাম দিয়ে ভরে ফেললাম। ঘরে ঢুকলেই এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি। সেটা ছিল জাস্ট ভালো লাগা।

কিন্তু এইটে উঠে আমি তার জন্য পুরোপুরি দুর্বল হয়ে পড়লাম।

বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য কোচিং করতাম যা ছিল বিকেলে। কিন্তু ভাইয়াও শুধু বিকেল বেলাতেই মাঠে খেলতে নামতেন। কি আর করা! কিছু পেতে হলে কিছু তো হারাতেই হয়।

তার জন্য ভোরের ব্যাচে চলে গেলাম।

আমি যে তার জন্য এতোটাই পাগল, অথচ তিনি তার বিন্দুমাত্র টের পেতেন না। গাধা আর কি! অবশ্য তাকে সেটা বোঝানোর জন্য প্রতিটি মুহূর্তেই সচেষ্ট ছিলাম।

ধরি তার নাম ক। আমাদের দোতলায় এক আপু ছিলেন আমার এক বছরের সিনিয়র।

একদিন আপু বললেন, ক ভাইয়াকে তিনি পছন্দ করেন।

প্রচণ্ড কষ্ট পেলাম। বাসায় এসে দুই দিন কান্নাকাটি করলাম। তারপর ঠিক করলাম আপুর ব্যাপারে সাহায্য করবো। তাই তখন থেকেই আমি যে তাকে পছন্দ করি বুঝতে দিইনি।

এর কয়েক বছর পর আমরা সে এলাকা ছেড়ে নিজেদের বাসায় চলে আসি। কিন্তু আমার কিছুই ভালো লাগতো না। কারণ আগের বাসার সঙ্গে এই বাসার বেশ ভালোই ব্যবধান।

অনেক কষ্ট করে তার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করলাম। প্রতিদিন ফোন করতাম। কিন্তু কোনো কথা বলতাম না। শুধু তার কথা শুনতাম।

তখন এসএসসি পরীক্ষার জন্য কোচিং করতাম। খুব ফাকিবাজ আমি। কিন্তু কোচিংয়ে যাবার পথে মাঝে মধ্যে তাকে দেখা যেতো। তাই কোচিং মিস করতাম না। অবশ্য এই নিয়মিত কোচিং করার ফলে আমার রেজাল্ট খুব ভালো হয়। আমি এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় A+ পাই।

পরীক্ষার পর তিন মাস কি করবো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। দৈনন্দিন কাজের তালিকায় একটি নতুন কাজ সংযুক্ত হলো। অজানা নাম্বারে ফোন করা। তাও শুধু ছেলেরা ধরলেই কথা বলতাম।

একদিন ওই ভাইয়াকে ফোন করলাম। প্রায় চার পাচ মাস ফোন করা হয়নি। সেদিন তার সঙ্গে কথা বললাম, মিথ্যে নাম দিয়ে। বকা দেয় কি না সেই ভেবে প্রচণ্ড টেনশনে ছিলাম। কিন্তু কিছুই হলো না। অনেকক্ষণ কথা হলো।

রাতে আবার ফোন করলাম। এভাবে তার সঙ্গে আমার কথা চলতে থাকে।

এক সময় তিনি জানতে পারেন আমি কে।

ঠিক করেছিলাম যদি তিনি আমার নাম জানতে পারেন তাহলে আর ফোন করবো না। কারণ এর মধ্যে তিনি আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ করে তিনি আমাকে অফার করে বসলেন। দিনটি ছিল পহেলা বৈশাখ।

একদমই প্রস্তুত ছিলাম না।

তিনি আমাকে দেখা করতে বললেন।

সেদিন থেকে শুরু আমাদের ভালোবাসার। এখন তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। পরিমাণটা বোঝানো সম্ভব নয়।

তবে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, ও আমাকে আরো বেশি ভালোবাসে।

ওর সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। ও একদম বাচ্চাদের মতো করে। আমার বোনকে খুব আদর করে এবং

আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড তাকে সারাক্ষণ রাগাতে চেষ্টা করে। আমাকে বলে, আমি যেন ওকে কিছুই না বলি।

আমার খুব ভালো লাগে ওর কাণ্ডকারখানা দেখতে। ফ্রেন্ডদের সামনে ওর মতো ভদ্র ছেলেটি আর কেউ নেই।

একা থাকলেই যতো সমস্যা। চুমুতে চুমুতে ও আমাকে অস্থির করে তোলে।

ওর ফ্যামিলির অনেকেই আমার কথা জানে। কিন্তু আসল সমস্যা হলো, আমার বাবা-মা ওকে মোটেই সহ্য

করতে পারে না। তাই যেন সহ্য করতে পারে সে চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি।

ও একটা ভেন্ডু। কিন্তু এ ভেন্ডুটাই আমার সব।

ওর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হয়। এই যেমন এখনো চলছে। অবশ্য মিটে যাবে। কারণ বেশি দিন রাগ করে থাকতে পারি না।

জানি না ওকে পাবো কি না। তারপরও ওকে ভালোবাসি, প্রচণ্ড ভালোবাসি।

ময়মনসিংহ থেকে